the ULABian

A STUDENT MOUTHPIECE

Contains exclusive Bangla and English content...

ঢাকা, বাংলাদেশ | ডিসেম্বর ২০১৩ | পৌষ ১৪২০ | সফর ১৪৩৫ | WWW.ULAB.EDU.BD/ULABIAN

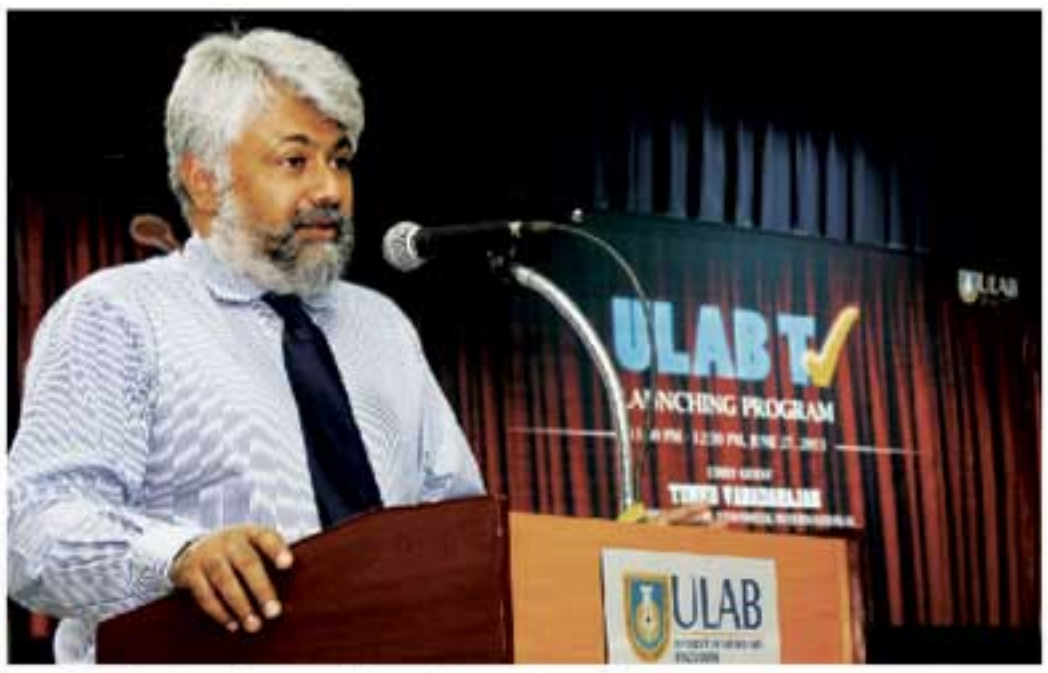

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদকর্মী টুকু ভারাদারাজান

ইউল্যাব টিভি সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

ঘড়ির কাঁটায় তখনও দশটা বাজেনি। অথচ দর্শক সারির একটা চেয়ারও খালি নেই! আর এরকম হবে নাই বা কেন? ইউল্যাব টিভির পর্দা উঠবে বলে কথা। টানটান উত্তেজনার মধ্যে কাউন্টডাউন হলো ইউল্যাব টিভির। খুলে গেল সম্ভাবনার নতুন দুয়ার। শুরু হলো দেশের প্রথম ক্যাম্পাস টেলিভিশনের যাত্রা। আর এ যাত্রাকে স্বাগত জানাতে একসঙ্গে হাজির গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, ইউল্যাব ফ্যাকাল্টি থেকে শুরু করে অজস্র তরুণ শিক্ষার্থী। বেলুন উড়িয়ে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব) এর একঝাঁক উদ্যমী মেধাবী তরুণ শপথ নিলেন আগামী দিনের সৎ, নির্ভেজাল ও নিবেদিতপ্রাণ 'মিডিয়া পারসোনালিটি' হবার।

বাস্তবিক অর্থেই সেদিন ইউল্যাব সেজেছিল বর্নাঢ্য সাজে। নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সম্পাদক, বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক টুংকু ভারাদারাজান আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দেশের প্রথম ক্যাম্পাস টেলিভিশন 'ইউল্যাব টিভি'র। এ উদ্যোগটির মাধ্যমে ইউনিভার্সিটির মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থীরা তত্ত্বীয় জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক ক্ষেত্রেও মেলে ধরতে পারবেন তাদের সৃজনশীলতা, এমনটাই মনে করেন ইউল্যাব ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান।

ক্যাম্পাস ভিত্তিক এ টেলিভিশন চালুর প্রথম উদ্যোগ সেই ২০১১ সালে। তারপর এক পা, দু'পা করে এগিয়ে যাওয়া । স্বপ্নকে খুব কাছে থেকে তাড়া করা এবং অবশেষে ছুঁয়ে ফেলা। ক্যান্টিনের হৈ-হুল্লোর, কাম্পাসের অলিগলি, পড়ুয়ার সফলতা কোন কিছুই আর থাকবে না গোপন। সবই এখন ক্যামেরাবন্দী করবে ইউল্যাবের তরুণ ভিডিও সাংবাদিকরা, আর প্রচারের উদ্যোগ নেবে ইউল্যাব টিভি'র পর্দায়।

প্রাথমিকভাবে, ইউল্যাব টিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার চলছে প্রতি মঙ্গলবার বেলা ২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে চলে সে অনুষ্ঠানগুলোর পুনঃপ্রচার। বিশ্ববিদ্যালয়ের উভয় ক্যাম্পাসের নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায় এর অনুষ্ঠানমালা।

ইউল্যাব টিভির এ এক ঘন্টাকে সাজানো হয়েছে বর্ণিল সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, যার প্রথম দশ মিনিটে প্রচার হয় ইউল্যাব সংবাদ। এছাড়া রয়েছে সাপ্তাহিক টক শো 'ইনসাইড স্টোরি', ডকুমেন্টারি 'রোড শো', পাক্ষিক ডকুমেন্টারি 'ফ্যাকাল্টি এন্ড স্টুডেন্ট প্রোফাইল'। পাশাপাশি মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম তো থাকছেই। বিশাল এ কর্মযজ্ঞের উপদেষ্টা হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাশে আছেন মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন এবং মাহবুবুল হক ওসমানী। আর মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের হেড প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো রয়েছেন সার্বিক দিক নির্দেশনায়।

বাংলাদেশের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে ইউল্যাব টিভি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষক আনিস আলমগীর। ইউল্যাব টিভির স্টেশন ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন ইসরাত জেরিন, হেড অফ প্রোগ্রাম পদে আশরাফুল আলম রুবেল এবং হেড অফ নিউজ এর দায়িত্ব পালন করছেন সামিরা তাসনিম করিম।

স্বপ্নের কোন সীমানা নেই। ইউল্যাব টিভির সাথে সংশ্লিষ্ট তরুণরা তাদের মতো করে এতোদিন প্রসারিত করে এসেছে তাদের স্বপ্নের সীমারেখা। ইউল্যাব টিভি তাদের নিয়ে যেতে পারে এমন এক উচ্চতায় যেখান থেকে খুব সহজেই ছোঁয়া যায় স্বপ্নের সেই আকাশ, সেই সীমানা। এ স্বপ্নাতুর তরুণরা একদিন বদলে দেবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম, বদলে দেবে বাংলাদেশ। এ প্রত্যাশা গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট সবার।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে টেলিভিশনের দুই উপদেষ্টা মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ও মাহবুবুল হক ওসমানীর সঙ্গে হাস্যোজ্জ্বল ইউল্যাব টিভি সদস্যদের একাংশ

ভিতরগড় প্রত্নস্থল: শেকড়ের সন্ধানে

ভিতরগড় প্রত্নস্থলে উৎখননকার্যে নিয়োজিত ইউল্যাব-এর 'এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য পাস্ট' শীর্ষক কোর্সের শিক্ষার্থীবৃন্দ

সানজিদা হক

বাংলাদেশ নামের বর্তমান এ ভূ-খন্ডে কবে থেকে মানুষের বাস? আমাদের ইতিহাস কত বছরের পুরনো? এর উত্তরে মহাস্থানগড় কিংবা পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন প্রমাণ দেয় আমাদের শিকড়ের বয়স অন্তত পক্ষে সাড়ে তিনহাজার বছর। উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের ভিতরগড় আমাদের তেমনি একটি প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচয় বহন করে চলছে। ভিতরগড় প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার ফলাফলকে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষক, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রনজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শিরিন আক্তার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সচিব একেএম জাকারিয়া। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ইউল্যাবের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম। ইউল্যাব প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এইচএম জহিরুল হক ও রেজিস্ট্রার লে. কর্নেল ফয়জুল ইসলাম (অবঃ)ও উপস্থিত ছিলেন এ সেমিনারে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. শাহনাজ হুসনে জাহান।

পঞ্চগড় জেলা শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অমরখানা ইউনিয়নে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ২৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ দুর্গ নগরী । একটি অন্যটিকে ঘিরে রাখা চারটি আবেষ্টনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এ দুর্গ নগরীটি গঠিত। প্রতিটি আবেষ্টনী আবার পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ আবেষ্টনীগুলোর ভিতর ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন নিদর্শন। ভিতরগড় এর গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো চারটি আবেষ্টনীর সমন্বয়ে গড়া দেয়াল, প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত স্তম্ভবিশিষ্ট বারান্দা সম্বলিত স্তূপ, চাষাবাদের জন্যে সেচ ব্যবস্থা ও নদীর পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাথরের বাধ নির্মাণের কৌশল এবং মহারাজার দিঘির সুউচ্চ ইটের পাড়।

ভিতরগড় প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার কাজে ইউল্যাব-এর অবদান অপরিসীম। গত ৩ মে এ খনন ও গবেষণা এর কাজে জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের 'এক্সপেরিয়েন্সিং দ্য পাস্ট' শীর্ষক কোর্সের অধীনে অংশগ্রহণ করে মোট ২১ জন ছাত্র-ছাত্রী। এ কোর্সটির শিক্ষক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান ২০০৮ সাল থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রাণালয়ের অধীনে ও প্রত্নতাত্ত্বিক অধিদপ্তরের অনুমোদনে এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করে আসছেন। এ কোর্সটির মূল লক্ষ্য শুধু ইতিহাস অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের একজন স্বার্থক, সুন্দর ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি একটি ভিন্ন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে কাছ থেকে দেখা এবং সর্বোপরি দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসতে শেখার একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, ভিতরগড় দুর্গনগরীর অমূল্য প্রত্নসম্পদ আজ অযত্ন, অবহেলা আর সংরক্ষণের অভাবে বিলীন হবার পথে। এ সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের।

দুর্নীতি প্রতিরোধে নবীন নেতৃত্বকে এগিয়ে আসার আহবান

এমএসজে ব্যাচ ৫, ইউল্যাব

শেষ হবার পথে বর্তমান সরকারের মেয়াদ। সংবিধান অনুযায়ী, অক্টোবর মাসেই বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে জানুয়ারিতে নতুন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাবে। আর আশা করা যায় এ সরকার নির্বাচিত হবেন জনগণের ভোটে। গতবারের মত এবারও ভোটার তালিকায় যোগ হয়েছে অনেক নতুন ভোটার। তাই কে হবেন নতুন সরকার প্রধান? কোন দল ক্ষমতায় আসলে দেশের ও জনগণের মঙ্গল হবে? কোন দলকে ভোট দেয়া উচিৎ? সর্বোপরি নতুন সরকারের কাছে জনগণ কি প্রত্যাশা করে? এসব নানামুখী প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ইউল্যাব এর মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের একদল শিক্ষার্থী রাজধানীতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলেছিল।

এতে দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের ৪২ ভাগ দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে সংঘটিত অপরাধ ও দুর্নীর্তি নিয়ে চিন্তিত। বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছরে সবচেয়ে আলোচিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে ছিল শেয়ার বাজার কেলেংকারী, পদ্মাসেতু ঋণ কেলেংকারী, হলমার্ক কেলেংকারী ও রেলমন্ত্রীর ঘুষ কেলেংকারী। দীর্ঘ সময় পরও এই দুর্নীতির গুলোর বিরুদ্ধে তেমন কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় সরকারের প্রতি এক ধরণের অনাস্থা দেখা দিয়েছে এই ৪২ ভাগ মানুষের মাঝে। এমন কি দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রহমানের বিদায়ী ভাষণে উঠে এসেছে কাজ করার ক্ষেত্রে দুদক-এর স্বাধীনতার অভাবের কথা। কেউ কেউ এ উদাহরণ দেখিয়ে মন্তব্য করেছেন, সরকার দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। আর এ সরকারের আমলে সবচেয়ে আলোচিত হত্যা ছিল সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনী হত্যাকাণ্ড। এ হত্যারহস্য উদঘাটন না হওয়ায় কেউ কেউ দেশের বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। এছাড়া এই হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে বিভিন্ন সময় প্রধানমন্ত্রীসহ সাবেক ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেয়া নানা বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন তারা।

এ তো গেল মুদ্রার এক পিঠ। মুদ্রার অন্য পিঠে চারদলীয় সরকারের আমলে ঘটে যাওয়া নানা রকম দুর্নীতিকে সামনে এনেছেন তারা। যে সরকারের আমলে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরাই বিদেশে টাকা পাচারের সাথে জড়িত ছিল বলে অভিযোগ আছে, সে দলকে নিয়ে অনেকে কোন কথা বলতেই আগ্রহ দেখাননি। এছাড়া আঠারো দল ক্ষমতায় আসলে উদ্ভূত পরিস্থিতি কি হতে পারে তা নিয়েও অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। অনেকেই মনে করেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করা এ সরকারের একটি বড় অর্জন। বর্তমান সরকারের আমলে দেশে জঙ্গী তৎপরতাও অনেকটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

কিন্তু আঠারো দল ক্ষমতায় এলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দেশে জঙ্গী গোষ্ঠী তৎপর হয়ে উঠতে পারে বলেও আশংকা তাদের। বিগত সরকারের সময় ১৭ আগস্ট সারাদেশে একযোগে বোমা হামলার ঘটনাকে অনেকে সামনে এনেছেন। এদের অনেকে আবার আঠারো দলীয় জোটের সাথে, জামায়াত এবং হেফাজতের সম্পৃক্ততা ভালো চোখে দেখছেন না। এ কারণে আঠারো দলীয় জোট ক্ষমতায় এলে ধর্মভিত্তিক এ দলগুলোর তৎপরতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেন তারা। তাই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমন একটি সরকার প্রত্যাশা করছেন দেশের মানুষ যারা সরকারের ভিতরে ও বাইরে কোন রকম দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না।

রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু রিক্সাচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল - নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা কি? বেশিরভাগ রিক্সাচালকের কথাতেই ছিল একটি সুর। সেটি হল সারাদিন রিক্সা চালিয়ে ঘরে ফেরার সময় তাদের বাজার করে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তারা যা আয় করেন তা দিয়ে পরিবারকে দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়াতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয় তাদের। বলা বাহুল্য, শুধু রিক্সাচালক নন, উত্তরদাতাদের ১৭ ভাগই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। চালের দামসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পন্যের দাম এমনভাবে বেড়ে গেছে যে তা কিনতে গিয়ে রীতিমত নাভিশ্বাস ওঠার মত অবস্থা বলে জানিয়েছেন এ রিক্সাচালকরা। কেউ কেউ অভিযোগের সুরে বলেন, "ক্ষমতায় গেলেই তো সবার চোখ ওপরে চলে যায়। আমাদের দিকে তখন কেউ আর ফিরেও তাকায় না। কয় টাকা আয় হয় আর চালের দাম কয় টাকা।" এ সবকিছুকে তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখছেন। তবে, রিক্সাচালকদের এ অভিযোগ বিশেষ কোন সরকারের প্রতি নয়। তারা বলেন, "যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুন না কেন দেশে অনেক উন্নয়ন হয় ঠিকই। কিন্তু আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় না।" তাই নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা, সরকার যেন শুরু থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তির মত খাতগুলোতে উন্নয়নের পাশাপাশি যেমন বেশ কয়েকটি উড়াল সড়ক নির্মাণ করায় সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই, তেমনি ঋণ কেলেংকারীর কারণে পদ্মা সেতু নির্মাণে কোনো অগ্রগতি না হওয়ার হতাশা প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রত্যাশা দেশের সবচেয়ে বড় সেতু, পদ্মা সেতু যেন বাস্তবে রূপ নেয়।

ছোট পরিসরের এ কর্মটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশাগুলোর বিষয়ে জানা। বেশিরভাগ অংশ গ্রহণকারী সরকারের কাছে প্রত্যাশা একটি দূর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা। আর সরকার কাঠামোতে তারা দেখতে চান নতুন মুখ। যারা হবেন শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও আধুনিক।

>> পৃষ্ঠা ৮, কলাম ১

ভিজোনটেলে VS. টেলিভিশন

যাওয়ার জন্য তাঁকে ছবি তুলতে হবে। তাতে তিনি কোনভাবেই রাজি না। কারণ তিনি সারাজীবন ছবি তুলেননি, দেখেনও নি। এমনকি আয়নায় নিজের মুখও না। অবশেষে ইসলামিক যে ধ্যান-ধারণা এতদিন তিনি পুষে রেখেছিলেন, সেটা কিনা তাকে শেষ পর্যন্ত ভাঙতে হল ইসলামেরই একটি মহান কাজে যোগ দেবার জন্য। কোহিনুরের সাথে সোলাইমানের বিয়ে ঠিক করে তিনি এককী রওয়ানা দেন ঢাকার উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে তিনি প্লেনে করে যাবেন।

ঢাকায় আসার পর চেয়ারম্যান দেখতে পান এখানকার মানুষ অনেক উন্নত কিংবা 'অশ্লীল'! যেসব ছবি তিনি এতদিন পত্রিকাতে ঢেকে রাখতেন, সে ছবিগুলোই ঢাকা শহরে আনাচে কানাচে ছড়ানো। তিনি খানিকটা অবাক কিংবা হতভম্ব হয়ে এসব দেখতে থাকেন। এয়ারপোর্টে আসবার পর তিনি দেখেন যে তাকে ঠকানো হয়েছে। টাকা পয়সা নিয়ে এজেন্ট পালিয়ে গেছে। তার মতই অনেক বৃদ্ধলোক এয়ারপোর্টে বসে কান্নাকাটি করতে থাকে। এখানে চেয়ারম্যানের কিছুই করার থাকে না। এখন তিনি যদি গ্রামে চলে যান, তবে তার অবস্থা দেখে লোকে নানা কথা বলবে। সেজন্য তিনি অত্যন্ত খারাপ মনে ঢাকার এক হোটেলে এসে উঠেন। খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি ছেড়ে দেন। ঘরের বাইরে যান না।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর হঠাৎ দিনের বেলা তিনি শুনতে পান "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" ধ্বনি। সে সুমধুর ধ্বনি যেটা সুদূর মক্কা শরিফে বলা হচ্ছে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে বাইরে বের হয়ে আসেন এবং দেখতে পান পাশের এক রুমে টিভি চালানো আছে এবং হজ্ব দেখানো হচ্ছে। তিনি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন। এরপর নিজের ঘরে ঢুকে হোটেল বয়কে দিয়ে টিভিটা চালু করান এবং "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" শুনতে শুনতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটতে চলেছে। তিনি ভুল বুঝতে পেরেছেন। যে যন্ত্র এতদিন তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেটা তার মনে শান্তি এনে দিচ্ছে। কি অদ্ভুত জীবন! তিনি কাঁদছেন... কেঁদেই চলেছেন।

নিন্দুকের কথা শুনে দু'টি সিনেমার তুলনা করতে হয়েছে আমাকে। নিন্দুকের কথা গ্রহণ করার এক অদ্ভুত গুণ আমার মধ্যে বিদ্যমান। কিন্তু কিছুতেই এ দু'টি সিনেমাকে এক রকম কিংবা কপি পেস্ট মানতে পারছি না। যতোদূর বুঝেছি যে, দু'টো সিনেমার নাম আর কাহিনীর কিছু অংশ একি রকম হলেও মুল কাহিনী ভিন্ন। আসুন নিন্দুকের কিছু কথার প্রতিউত্তর দেই।

নিন্দুক: দু'টো সিনেমার নাম একি। নাম চুরি করা হয়েছে।

লেখক: দু'টো সিনেমা দুই দেশের। একি নাম নিতেই পারে, ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল দুই নিয়মেই দু'টো দেশে একি নাম নিয়ে সিনেমা বানানোর অনুমতি রয়েছে। একই নামের কয়েকলাখ সিনেমা নেটে ঘুরঘুর করছে। ফারুকীর টেলিভিশন তুর্কি টেলিভিশনের নামের সাথে মিলে গেলেও এতে কোন দোষের কিছু নেই। আমি বাংলাদেশে বসে যদি ট্যাক্সি নিয়ে সিনেমা বানাই, তাহলে কি সেই সিনেমার নাম ট্রাক রাখবো!

নিন্দুক: দু'টো সিনেমার কাহিনী একি। ফারুকী নকল করে সিনেমা বানিয়েছে।

লেখক: দু'টো সিনেমার কাহিনীই একটি অজপাড়াগাঁয়ে টেলিভিশন আসা নিয়ে। এছাড়া দু-একটা চরিত্র দু'টো সিনেমাতে কিছুটা একই রকম। কিন্তু মূল কাহিনী এক নয়। যারা দু'টো সিনেমাই দেখেছেন তারা বুঝবেন। মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী খুব সম্ভব তুর্কী সিনেমাটা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এতে তার সিনেমায় কিছু ছাপ থাকতেই পারে। মানুষ অনুপ্রানিত হয়ে অনেক কাজ করে থাকে। কিন্তু সেটা'র অপব্যাখ্যা তৈরি করার চেষ্টাটা খুব একটা শুভ পদক্ষেপ নয়।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: ডঃ জুড উইলিয়াম হেনিলো, উপদেষ্টা সম্পাদক: বিকাশ সিএইচ ভৌমিক, সম্পাদক: জুলকার নাঈন (এমএসজে), উপ-সম্পাদক: এ এস এম রিয়াদ আরিফ, ইউল্যাবিয়ান দল: সানজিদা হক (এমএসজে), সজল বি রোজারিও (এমএসজে), জান্নাতুল ফেরদৌস (এমএসজে), জাহিদ গগন (এমএসজে), আয়েশা খান (এমএসজে), শুভ বসাক নিকুঞ্জ (ইউএসবি), অরিত্র অংকন মিত্র (এমএসজে), নকশা ও অলংকরণ: থ্রিআরএমসি।
পত্রিকাটি পাঠকের মতামতকে সর্বোচ্চ গুরত্ব দিতে বদ্ধপরিকর। আপনার মতামত পাঠাতে পারেন এই ই-ঠিকানায়: theulabian@ulab.edu.bd

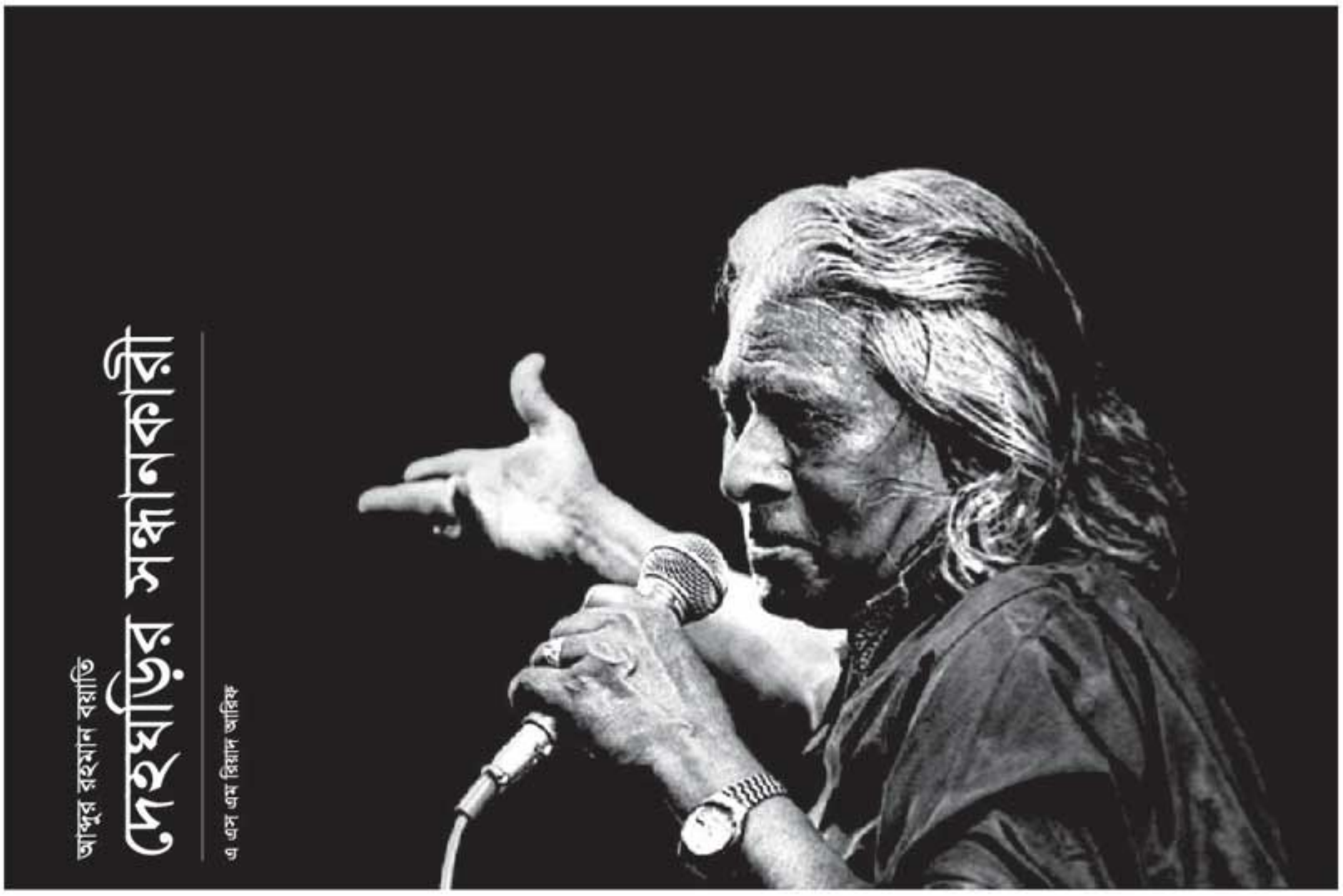

আব্দুর রহমান বয়াতি
দেহঘড়ির সন্ধানকারী

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

'মন আমার দেহঘড়ি
সন্ধান করি
কোন মিস্তরি বানাইয়াছে'

অবশেষে দেহের ঘড়ি থেমে গেল। গত ১৯ আগস্ট চলে গেলেন আজন্ম দেহঘড়ির সন্ধান করা আব্দুর রহমান বয়াতী। পৃথিবী হয়তো যেমন ছিল তেমনই থাকবে। নিত্যকার নিয়মে মেঘ হতে বৃষ্টি ঝরবে, ভোরের আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হবে। সে আলোয় একটি দাঁড়কাক উঠোনে খেলা করবে। শুধু আর কখনো ফিরে আসবেন না লোকজ সঙ্গীতের অনন্য এক অধ্যায় সংযোজনকারী আব্দুর রহমান বয়াতী। আমাদের লোক সঙ্গীতের একজন কিংবদন্তি তিনি। যিনি আজীবন মাটি ও মানুষের কথা বলে গেছেন তাঁর গানের কথায় ও সুরে।

'এই পৃথিবী যেমন আছে
তেমনি পড়ে রবে
সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন
চলে যেতে হবে'

কিংবা 'দিন গেলে আর দিন পাবি না', 'আমার মাটির ঘরে ইঁদুর ঢুকেছে', 'মরনেরই কথা কেন স্মরণ কর না' - এমন অসংখ্য জনপ্রিয় গানের গায়ক তিনি। 'দেহঘড়ি' গানটির গীতিকারও তিনি। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গানের অ্যালবাম সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। স্বকীয় গায়কী'র মধ্য দিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশেও অগনিত শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছে তাঁর গান। বিশ্বের অনেক দেশে তাঁর জাদুকরি সুরের মূর্চ্ছনায় কোটি মানুষের হৃদয় জয় করেছেন তিনি। গান গাওয়ার ডাক এসেছিল খোদ হোয়াইট হাউজ থেকে। প্রেসিডেন্ট বুশের আমন্ত্রনে গেয়েছেনও সেখানে। পৌঁছে দিয়েছেন বাংলার মাটি ও মানুষের সুর।

আমাদের আশ্চর্য সুন্দর এক লোক গানের ভাণ্ডার রয়েছে। মাটির কাছের মানুষগুলোর কথা, লোকাচার কিংবা লোক-জীবনের কথা, দৈনন্দিন জীবন যাপন ও জীবনের হাজারো পাওয়া না পাওয়া - এসবই লোকগীতির মূল উপজীব্য। এতে লুকিয়ে আছে ব্যাপক বাস্তব জীবনের নানান উপকরণ। এসব লোকসঙ্গীত যেমন মানবজীবনের গভীরতম উপলব্ধি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হয় তেমনি রোমান্সধর্মী কল্পনারও বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পল্লীগ্রামে খানিকটা জমাট আসর বসিয়ে লোকশিল্পীরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় একতারা হাতে ডুগডুগি বাজিয়ে গান শোনান শ্রোতাদের। কখনো কখনো সারারাত ধরে চলে এসব আসর। সিরাজ সাঁই, লালন সাঁই, হাসন রাজা, আব্বাস উদ্দিন, আব্দুল আলীম কিংবা বাউল আব্দুল করিম'রা যুগ-যুগ ধরে সমৃদ্ধ করে গেছেন এ ধারাকে। আব্দুর রহমান বয়াতী ছিলেন সে ধারারই একজন স্বার্থক উত্তরাধিকারী।

আব্দুর রহমান বয়াতীর জন্ম ১৯৩৯ সালে ঢাকা জেলার সূত্রাপুর থানার দয়াগঞ্জে। এ দয়াগঞ্জের ধুলো-জলেই তাঁর বেড়ে ওঠা। শৈশব আর কৈশোরে চারদিকে অপার প্রকৃতির সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন, তার সাথে গড়েছেন সখ্যতা। জীবন ও প্রকৃতিকে তাই তিনি আলাদা ভাষায় দেখেননি। বরং এ দুইয়ের দারুন এক পারস্পরিক সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় তাঁর অসংখ্য গানে। জীবনকে তিনি অনেকখানি কাছে থেকে দেখতে পেরেছিলেন। ঢুকেছিলেন জীবনের বেশ গভীরে। তবু তাঁর গানের কথা সহজ ও সাবলীল। যে গান মানুষের কথা বলে। সেসব মানুষদের কথা যারা খেটে খায়, মহাজনের শোষণে নিষ্পেষিত হয়। প্রখ্যাত এ শিল্পীর সঙ্গীতে হাতেখড়ি কবি আলাউদ্দিন বয়াতীর সাহচর্য্যে। তাঁর কাছেই বাউল ধর্মের দীক্ষা নেওয়া। বাউল তত্ত্বের মানবতা, সাম্যবাদীতা আর জীবনের প্রগাঢ় অন্তর্নিহিত অর্থ আব্দুর রহমান বয়াতীও খুঁজেছেন আজীবন। খুঁজেছেন জীবনের চাবিওয়ালা মিস্ত্রিকে। কেবল আমরাই খুঁজে পেতে ব্যর্থ তাঁর মতো লোকজ ধারার শিল্পীদের। লোক সঙ্গীতের অনবদ্য সব সুরে আমরা পাই শেকড়ের খোঁজ। আমাদের পরিচয় আর অস্তিত্বের সন্ধান। কিন্তু তারপরও, আব্দুর রহমান বয়াতীর মতো লোক শিল্পীদের চলে যেতে হচ্ছে চরম অযত্ন আর অবহেলায়। ধীরে ধীরে আমরাও অনেকটা হয়ে পড়ছি শেকড়-ছাড়া। এমনিভাবে চলতে থাকলে হয়তো অচিরেই পরিচয়হীনতার দ্বন্দ্বে পড়তে হবে আমাদেরকেই।

আব্দুর রহমান বয়াতী জাপান ফ্রেন্ডশীপ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে "আবারও গান গাইবার চাই" বলে আকুতি জানিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন বেঁচে থাকার সুতীব্র ইচ্ছার কথা। টেলিভিশনের পর্দায় আমরা সে আকুতি দেখেছি। কিন্তু আমাদের নাগরিক ব্যস্ততায় কারও একটি বারও দ্বিতীয়বার ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি, সদিচ্ছাটুকু জন্মায়নি সেই বাঁচবার আকুতিতে একটু সাড়া দেবার।

জীবন সুন্দর, আকাশ সুন্দর। ঘাসফুল, পাখিরা সুন্দর। তবু এতো সব সুন্দরের মাঝ থেকে চলে গেলেন বয়াতী আব্দুর রহমান। তবু তার সৃষ্টি বেঁচে থাকবে সময়ের খাঁচায়। মহাপ্রলয়ের আগমুহূর্ত পর্যন্ত খোঁজ করে যাবে সেই অলীক ঘড়ির কারিগরের। আর মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ভালোবাসা কুড়িয়ে যাবেন দেশের লোকসঙ্গীতপ্রেমী লক্ষ-কোটি শ্রোতার।

« পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

বিদায়ের আগুনে, আগামীর শপথ

ব্যাচের সকল ছাত্রছাত্রীদের মিলিতভাবে কেক খাওয়া, ফটোসেশনে অংশ নেয়া এবং রং খেলা। যা চলে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এসময় তাদের একে অপরকে অন্যজনের টিশার্টে বিভিন্ন ধরনের কথা লিখতে দেখা যায়। যার কিছু ছিল মজার আর কিছু ছিল বেদনার। '৪ বছর হয়ে গেল, আমার ক্যালকুলেটর কোথায়?', 'ছেলেটা, তুই এখনও মানুষ হলি না'; 'বন্ধু আমায় কিন্তু ভুল না!' এমনই সব মজার আর হৃদয়স্পর্শী কথা স্থান পেয়েছিলো একেকজনের লেখনীতে।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় সীমান্ত স্কয়ারের ইমানুয়েলস কনভেনশন সেন্টারে। মিউজিক্যাল ব্যান্ড শো, ভাঙ্গ, গেমস সেশন, ডিনার, ডিজে পার্টি এবং সবশেষে সৌজন্য ক্রেস্ট বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয় রাত ১১টায়।

প্রথম পর্বটা যদি হয় আনন্দঘন তবে দ্বিতীয় পর্বের শেষটা ছিল বেদনাবিধুর। এই প্রসঙ্গে ১০১ ব্যাচের বিদায়ী ছাত্র আশরাফ উল ইসলাম বলেন, "সবার মত আশা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভার্সিটি জীবন শুরু। এত তাড়াতাড়ি সময় শেষ হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি। শেষ ক্লাস-পরীক্ষার দিন আমার চোখে পানি চলে আসে। তখন বুঝতে পারি ইউল্যাবকে আসলে কতটা ভালবাসি"।

থিয়েটার ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি শরীফ সাজিদ হোসেনের মতে, "ছোটদেরকে পড়ার ফাঁকে খেলতে দিলে তারা বুঝতে পারে না, কিভাবে তাদের সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের কাছে মনে হয় এইতো একটু আগে খেলা শুরু করলাম, এখনই সময় শেষ! আমার কাছেও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।" মিডিয়া ক্লাবের বিদায়ী সভাপতি তানজিম তাশফিয়া শান্তা বলেন, "আমার সব ক্লাসমেট, ক্লাব সদস্যদের মিস করবো। সর্বোপরি ইউল্যাবকে অনেক বেশি মিস করবো।"

বিদায় বেলায় এসব অগণিত বড় ভাই-আপুদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ইউল্যাব ভবিষ্যতে অনেক ভাল করবে, অনেক ভাল থাকবে। যেখানে, যতদূরেই যাক, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইউল্যাবের নামকে উজ্জ্বল করবে প্রত্যাশা এটুকুই।

ফটো কনটেস্টে বিজয়ীদের সঙ্গে (উপরে বা থেকে) ইউল্যাব প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. জহিরুল হক, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ঢালি আল মামুন, ইউল্যাব ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান, এমএসজে বিভাগীয় প্রধান ড. জুড উইলিয়াম হেনিলো, সিনিয়র লেকচারার এমএ কাদের ও ইউল্যাব রেজিস্ট্রার অবসরপ্রাপ্ত লেফটেনেন্ট ফয়জুল ইসলাম।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কৃত করল ইউল্যাব

আয়েশা খান

একটি চিত্রকল্প হল একটি বক্তব্য। একটি ছবি একটি যুগকে আটকে রাখে তার ফ্রেমে। সময়কে ছবির ফ্রেমে ধরে রাখার সাফল্যে তেমনি ক'জন সফল আলোকচিত্রী সম্প্রতি সম্মানিত হলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ। ইউল্যাবের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে দেয়া হল সম্মাননা পুরস্কার । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ঢালি আল মামুন। তাঁর ভাষায়, "মানুষ হল সৃজনশীল প্রাণী, আর সৃজনশীল পদ্ধতি হল সেই প্রক্রিয়া যা নিজেকে মুগ্ধ করে।"

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে ইউল্যাব এর মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্ট এর বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর জুড উইলিয়াম হেনিলো ছবি'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "এটা শুধু স্মৃতি ধারণই করে না। বরং স্মৃতি তৈরীও করে। বর্তমান যুগে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট এর ক্ষেত্রে ক্যামেরার ভূমিকা অপরিসীম। এই ক্যামেরাই বর্তমানের নান্দনিক শৃঙ্খলাকে পাল্টে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।" অধ্যাপক ঢালি আল মামুন বলেন তার বক্তব্যে বলেন, "একটি চিত্রকল্প হল একটি বয়ান, যার কোন মৃত্যু নেই। এটি নিজেই নিজের ভাষা ধারণ করতে পারে। এ চিত্রকল্পর মধ্যে থাকে কিছু মুহূর্ত যা চলমান। কিন্তু সেটি সে মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং যার মাধ্যমে তেরী হয় একটি ইতিহাস।"

আলোকচিত্র প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী মোট ৬০টি ছবির মধ্যে ১২টি ছবি নির্বাচিত করা হয় যেগুলো ইউল্যাব এর আগামী বছরের ক্যালেন্ডারের পাতায় স্থান করে নেবে। এতে 'অন মাই মাদার্স ল্যাপ' ও 'ক্রীম ফর লিবার্টি' শিরোনামের ছবিগুলো মাধ্যমে ১ম ও ৩য় স্থান জয় করে নেন ইউল্যাব এর মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় সেমিস্টারে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী তুরহান আল নাহিয়ান। শিংখানু মারমা'র তোলা "ফ্রেন্ডশীপ" প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার তুলে দেন ইউল্যাব এর ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান এবং প্রফেসর ঢালি আল মামুন। অতপরঃ প্রফেসর ঢালি আল মামুনের হাতে একটি সম্মাননা স্মারক তুলে দেন প্রফেসর ইমরান রহমান। প্রফেসর ইমরান রহমান তার বক্তব্যে বলেন, "একটা সময় ছিল যখন ডিজিটাল ক্যামেরা ছিল না, ফিল্ম কিনে ছবি তুলতে হতো। তখন আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে ছবি তুলতে হতো যাতে ছবি নষ্ট না হয়। কিন্তু বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবাদে সুযোগ সুবিধা দুটোই বেড়েছে পাল্লা দিয়ে।"

জেন্ডার বেইস্ড্ ভায়োলেন্স: প্রামান্য চিত্রের প্রদর্শনী

এ এস এম রিয়াদ আরিফ

ওদের জীবনের অনেকটা সময়ই কাটাতে হয় চার দেয়ালের ভেতর। মুক্ত আকাশে ডানা মেলার অধিকার ওদের নেই। তবুও তারা স্বপ্ন দেখে। রঙ্গিন নকশি কাঁথায় বোনে জীবনের জয়গান। ওরা নারী। ওরা আমাদেরই কারও মা, কারও বোন কিংবা কারও প্রেয়সী।

আমাদের সমাজ কাঠামোর অদৃশ্য এক জাল ওদেরকে দিগন্ত ছোঁয়ার অধিকার বঞ্চিত করেছে। জেন্ডার বেইস্ড্ ভায়োলেন্স আমাদের সমাজের এক অভিশাপ। ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে বসবাসকারী নারীদের অবস্থান সেখানে আরও ভয়াবহ, আরও করুণ। জীবন এখানে অনেক বেশি নির্মম। দারিদ্রের কষাঘাতে যখন জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরনই স্বপ্নাতীত সেখানে ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে, শারীরিক ও মানষিক নির্যাতনের মাধ্যমে, বাল্যবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ সহ অজস্র বৈষম্যের শিকার হচ্ছে নারীরা। এমন দুর্বিষহ জীবনের কথাই উঠে এসেছে এ তথ্যচিত্রে।

গত ২৩ জুলাই ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস এবং তরঙ্গের যৌথ আয়োজনে প্রদর্শিত হলো জেন্ডার বেইস্ড্ ভায়োলেন্সের উপর নির্মিত দুটি প্রামাণ্য চিত্র 'নতুন জীবনের ঠিকানা' ও 'ইস্পাতের কান্না'। ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইউল্যাবের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত লুইস তেখাদা। মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের ভিডিও কমিউনিকেশন - ১ কোর্সের শিক্ষার্থীরা উন্নয়নমূলক সংস্থা তরঙ্গের সহায়তায় অনবদ্য এ তথ্যচিত্র দু'টি নির্মান করে। যার আর্থিক সহায়তায় ছিল স্প্যানিশ এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন।

প্রামাণ্যচিত্র দু'টির ফ্রেমে উঠে আসে ঢাকার বস্তিগুলোতে বাস করা নারীদের না বলা সব কথা, তাদের জীবন-যাপন, পাওয়া, না-পাওয়া আর হতাশা। তাদেরই একজন মরিয়ম। জন্মের আগেই বাবাকে হারানো মরিয়মের শৈশব কাটে তার সৎ বাবার সংসারে। কখনও স্কুলমুখী হওয়ার সুযোগ হয়নি তার। পারিবারিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে মরিয়ম। এখন সে গার্মেন্টসকর্মী।

অনুষ্ঠানে তথ্যচিত্র প্রদর্শণের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় নারী অধিকার বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক। এতে অংশ নেন ব্লাস্ট, নারীপক্ষ, সারভাইবাল, তরঙ্গ ও অপরাজেয় এর বেশ ক'জন প্রথিতযশা নারীনেত্রী। এছাড়া নারীদের নির্মিত বিভিন্ন হস্তশিল্পের প্রদর্শনীও ছিল আয়োজনে।

কোর্সের শিক্ষার্থী ও তথ্যচিত্র দু'টির অন্যতম নির্মাণ কুশলী দিল আফরোজ জাহান তথ্যচিত্র দুটি তৈরি করতে গিয়ে দূর্লভ সব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন সবার মাঝে। দুটি প্রামাণ্যচিত্রেরই নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ছিলেন মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টেরর শিক্ষক মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। নারী আমাদের সমাজ দেহের অর্ধাঙ্গ। আমাদের সুনীল আকাশ হবে এমন এক আকাশ, যার নিচে দাড়িয়ে নারী কিংবা পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ ভোগ করবে মানবিক সকল অধিকার। এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত নারী নেত্রীবৃন্দ।

দ্য ভয়েজ অফ হোপ

>> পৃষ্ঠা ৮, কলাম ২

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্পেনের মাননীয় রাষ্ট্রদূত লুইস তেখাদা

সাক্ষাৎকারের গ্রহণের এক পর্যায়ে অং সান সু চি'র উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, "কোন গুণটির দ্বারা আপনি এরকম একটা অভাবনীয় সামরিক শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে টিকে থাকতে পারলেন?", প্রত্যুত্তরে অং সান সু চি বলছিলেন , "সাহস! নিজের স্বার্থ থেকে চোখ ফিরিয়ে, পরিপার্শ্বিক জগতকে দেখার জন্য প্রয়োজন হয় সাহসের। কর্মক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় আরও বেশি সাহসের। কোন কাজে না জড়ানোর জন্য কিংবা কোন অজুহাত সৃষ্টি না করার জন্য প্রয়োজন হয় সাহসিকতার। অন্যদিকে দুর্নীতি পরায়ন না হবার জন্য প্রয়োজন হয় সাহসিকতার। সত্যকে জানা কিংবা সত্যকে স্বীকার করা কিংবা নিজের বিবেককে অনুভবের জন্য প্রয়োজন হয় সাহসের।"

অং সান সু কি র মতে সাহস তিন প্রকার। দেখার সাহস, অনুভব করার সাহস এবং পদক্ষেপ নেয়ার সাহস। "দ্য ভয়েস অব হোপ" সত্যিকার অর্থেই এক আশার বানী শোনায় আমাদের। পৃথিবীর সকল বঞ্চিত, নির্যাতিত মানুষের জন্য এ যেন এক আশার আলো। এমন এক দর্শন পাঠকের চোখের সামনে খুলে গেল, যার রূপ, স্পর্শ, সৌরভ থেকে আমরা এতদিন বহুদূরে ছিলাম।

ইউল্যাব শিক্ষার্থীদের মাঝে
সম্পাদক নঈম নিজাম

জান্নাতুল ফেরদৌস

"তারকাখ্যাতি যেন কোনও ভাবেই সাংবাদিকতাকে ছাপিয়ে যেতে না পারে। ভাল সম্পাদনার ফলে যে কোনও সংবাদের মান অনেকাংশে বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি ভুল সম্পাদনায় বদলে যেতে পারে পুরো খবরটি।"

কথাগুলো বলেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক নঈম নিজাম। গত ২৪ জুন ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের আমন্ত্রণে সাংবাদিকতা জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' পত্রিকার সম্পাদক নঈম নিজাম। 'নিউজ এডিটিং এন্ড ট্রান্সলেশন' শীর্ষক কোর্সের শিক্ষার্থীদের মাঝে সম্পাদক হিসেবে বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা আর পেশাগত প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরেন তিনি।

সংবাদ সম্পাদনার কৌশলগত বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি পরামর্শ দেন শিক্ষার্থীদের। তিনি বলেন, " একজন সম্পাদকের উচিৎ দিনের সবগুলো নিউজ স্টোরি ক্রস চেকের মাধ্যমে সম্পাদনা করা।" রিপোর্টিং এর নানা দিক নিয়েও তিনি কথা বলেন। অনলাইন সাংবাদিকতার ভালো দিকগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি তাঁর মতে অনলাইন সাংবাদিকতায় সংবাদ অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা হারাচ্ছে। তিনি বলেন, "দিন দিন অনলাইন নিউজ পোর্টালের সংখ্যা বাড়ছে এবং অনেক নিউজ পোর্টাল ভুল সংবাদও প্রচার করে যাচ্ছে। যা কখনই কাম্য নয়। তবে কিছু কিছু অনলাইন পোর্টালের সংবাদ প্রকাশের ধরন এ ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।"

কোর্সের শিক্ষার্থী তানজিনা আক্তার জানান, "একজন সম্পাদকের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা আমাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে।" কোর্সটির আরেক শিক্ষার্থী মোঃ আমির বলেন, "নঈম নিজামের মতো প্রবীণ সংবাদকর্মীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের পাথেয় হবে বলে আশা করি।"

আলোচনায় সম্পাদক নঈম নিজামের পাশাপাশি কোর্সের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোঃ আসিউজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিজের বর্ণাঢ্য সাংবাদিকতা জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন দৈনিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক নঈম নিজাম

নেশান ব্র্যান্ডিং এবং গ্লোবাল মিডিয়া

আয়েশা খান

দক্ষ মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার আর বিশ্বের বুকে নিজেদের যথাযথ ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পারলে এ দেশও ঠাঁই করে নিতে পারে উন্নত বিশ্বের কাতারে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প এ ক্ষেত্রে রাখতে পারে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা। গত ১ জুলাই ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসের মিডিয়া স্টাডিস অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে অনুষ্ঠিত পাবলিক ফোরামে এভাবেই মত ব্যক্ত করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক, নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের সাবেক সম্পাদক টুংকু ভারাদারাজান। প্রতি সেমিস্টারের মত এবারের নিয়মিত আয়োজনের বিষয়বস্তু ছিলো 'নেশান ব্র্যান্ডিং অ্যান্ড গ্লোবাল মিডিয়া'।

মূলত ফোরামগুলোর অন্যতম লক্ষ্য হল যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় কিভাবে নেতৃত্ব তৈরী করতে হয় সেই সম্পর্কে স্নাতোকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদেরকে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা। এবারের ফোরামে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ছিলেন টুংকু ভারাদারাজান। বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সুমন রহমানের উপস্থাপনায় মধ্য দিয়ে সকাল ১১টায় শুরু হয় ফোরামের আলোচনা পর্ব। এসময় অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাবের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান, মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজ ডিপার্টমেন্ট এর বিভাগীয় প্রধান ড. জুড উইলিয়াম হেনিলোসহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

টুংকু তার বক্তব্যে বলেন, "ব্র্যান্ডিং একটি শিল্প। যে শিল্প মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে।" যে কোন দেশের ভাবমূর্তি অন্য দেশের মানুষের কাছে এবং দেশের কাছে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য ব্র্যান্ডিং আবশ্যক বলে মনে করেন তিনি। ব্র্যান্ডিং এর রোল মডেল হিসেবে ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের চিত্র তুলে ধরেন টুংকু। তিনি বলেন, "ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ পিছিয়ে থাকা থেকে উত্তরণের জন্য গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।" তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশ শিল্প-সংস্কৃতি এবং ভাষার দিক থেকে অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক এগিয়ে। এ দেশের এমন একটি উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে যা অন্যান্য দেশে নেই।" সবশেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে টুংকু ভারাদারাজান আলোচ্য ফোরামে তার মূল্যবান আলোচনা সমাপ্ত করেন।

নেশান ব্র্যান্ডিং এবং গ্লোবাল মিডিয়া'র উপর আয়োজিত ফোরামে বক্তব্য রাখছেন টুংকু ভারাদারাজান

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কর্মশালা

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

"চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি, বেলা শুনছো" অঞ্জন দত্তের মত গ্র্যাজুয়েশন শেষে সবাই তার প্রিয়জনকে এ বার্তা দেয়ার প্রত্যাশায় থাকে। কিন্তু ক'জনের কপালেই সে সৌভাগ্য জোটে! সত্যি, আজকের দিনে চাকরিটা যেন সোনার হরিণ। ধরা দিতে চেয়েও যেন সবসময় ধরা দেয় না। সেই অধরা চাকরিকে বশে আনার জন্য কিছু পদ্ধতি জানা দরকার, দরকার কিছু আদব-কায়দা। ইউল্যাবের ক্যারিয়ার সার্ভিস সেন্টার সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ ধরনের সুযোগ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এ ধারাবাহিকতায় গত ২৯ জুলাই বেলা ১১টায় ইউল্যাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ক্যারিয়ার বিষয়ক ওয়ার্কশপ 'ক্যারিয়ার প্ল্যানিং'।

কিভাবে চাকরির খুঁজবো, কোথায় খুঁজবো, কিভাবে সিভি লেখা উচিত, ইন্টারভিউতে কী করা উচিত আর কী করা উচিত না, ইন্টারভিউয়ের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নেবো - এমন সব দরকারি প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই ছিল ইউল্যাবের ক্যারিয়ার সার্ভিস সেন্টার আয়োজিত এই কর্মশালা। সকল ইউল্যাবিয়ানদের জন্য উন্মুক্ত এই কর্মশালায় ইউল্যাবের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্স বিভাগের ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট শাখার ম্যানেজার নাজমুস সাদাত এবং প্রথম আলো জবসের সহকারী ব্র্যান্ড ম্যানেজার আরিফ আহমেদ। এছাড়া এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব ক্যারিয়ার সার্ভিস সেন্টারের প্রধান মোহাম্মদ আলী খান।

ইউল্যাব বইমেলা ২০১৩

প্রমা সঞ্চিতা

'বল বীর-
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রীর!'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার এ প্রথম তিন চরণ কার না জানা! পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত চুরুলিয়া গ্রাম থেকে উঠে আসা সেই বিদ্রোহী তরুণই কালক্রমে হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমৃত কাব্যরসের অনন্য আস্বাদ কোন বাঙ্গালীরই বা অজানা! সমসাময়িক এ দুই বিরল প্রতিভার কাছে চিরঋণী আমাদের এ বাংলা সাহিত্য। এ বছরই পূর্ণ হতে চলেছে কবি রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির ও কবি নজরুলের বাংলাদেশে পদার্পণের শতবর্ষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাপ্তির ও কবি নজরুল ইসলামের বাংলাদেশে আগমনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৮ ও ২৯ মে ইউল্যাব-এর ক্যাম্পাস-এ প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয়েছিল বইমেলার। স্বল্প পরিসরের সুপরিকল্পিত এ মেলাটিতে অংশ নিয়েছিল 'ইউল্যাব প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র' সহ মোট পাঁচটি প্রকাশনী। অন্যান্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ছিলো বাংলা একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, পাঠক সমাবেশ ও কাগজ প্রকাশনী। প্রতিটি স্টলে সুলভ মূল্যে পাওয়া গিয়েছে মূল্যবান বেশ কিছু বই।

প্রথমেই ছিল বাংলা একাডেমীর স্টল। এ স্টলে ছিল 'প্রমিত বাংলা বানান রীতি', 'প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যকরণ', নজরুল সমগ্র ও রবীন্দ্র রচনাবলী সহ আরও বেশ কিছু প্রকাশনা। মেলায় অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি-মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠান 'নজরুল ইনস্টিটিউট'। এ স্টলের প্রধান আকর্ষণ ছিল ১২ খণ্ডে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলী। এছাড়াও 'নজরুলের উপন্যাস সমগ্র', আবদুল মান্নান সৈয়দ সহ অন্যান্য সাহিত্যিকদের রচনাবলীও স্থান পেয়েছিল নজরুল ইনস্টিটিউট-এর প্রকাশনীতে। পাঠক সমাবেশের স্টলে ছিল ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনা সমগ্র'। এছাড়াও কবি নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ও কবিতার বইগুলো আলাদাভাবেও বিক্রি হতে দেখা গেছে এ স্টলে। কাগজ প্রকাশনীতে স্থান পেয়েছে কাজী শাহেদ আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লিখিত উপন্যাস 'ভৈরব'। এছাড়াও এই লেখকের আরেকটি উপন্যাস 'আমার লেখা' ও প্রকাশ করেছে কাগজ প্রকাশনী। ইউল্যাবের নিজস্ব প্রকাশনা ও বিক্রয় কেন্দ্রটি ছিল সর্বশেষ স্টল। এতে বেশ সুলভ মূল্যে পাওয়া গিয়েছে বেগম জাহান আরা, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম প্রমুখ লেখকের বেশ কিছু বই। এ মেলার প্রতিটা স্টলেই বইয়ের উপর ছিল ২৫-৩০% পর্যন্ত মূল্যছাড়।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ২৮ মে, সকাল ১০টায়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যতম কর্ণধার কাজী শাহেদ আহমেদ, প্রফেসর ইমেরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম, ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইমরান রহমান, প্রফেসর সলিমুল্লাহ খানসহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী আল নাহিয়ান।

সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিত এ অনুষ্ঠানটিকে তাঁদের মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য দ্বারা অলংকৃত করেন প্রফেসর ইমেরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম, সুলেখক কাজী শাহেদ আহমেদ ও প্রফেসর শামসুজ্জামান খান। সবশেষে ফিতা কেটে 'ইউল্যাব বইমেলা-২০১৩'-এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর শামসুজ্জামান খান।

ক্লাব ডে উদযাপন

সানজিদা হক

"আমাদের সময়ে ক্লাবের অর্থই ছিলো কিছুটা সময় কাটানো, বন্ধুদের সাথে আড্ডা। কিন্তু এখন এর অর্থ হলো সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে বের করে আনা। একজন শিক্ষার্থী পড়ালেখায় ভালো না হলেও সে একজন ভালো পারফর্মার হতে পারে।" কথাগুলো ইউল্যাবের ইংলিশ এন্ড হিউম্যানিটিস বিভাগের প্রধান এবং সাহিত্যিক প্রফেসর মুহিত-উল-আলমের। নিয়মিত আয়োজনে গত ২০ জুন ইউল্যাব অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত ক্লাব ডে'তে দুই সময়ের মাঝে পার্থক্যকে তুলে ধরলেন তিনি।

স্বপ্নাতুর এক ঝাঁক নতুনের আগমনে বরাবরের মত মুখরিত ইউল্যাব পরিবার। তাদের বরণ করতে প্রস্তুত ইউল্যাবের ক্লাবগুলো। নাচ, গান, অভিনয় আর আবৃত্তিতে ইউল্যাবের ১৩টি ক্লাব নিজেদের উপস্থাপন করল নতুন শিক্ষার্থীদের মাঝে। তাদের পরিচয় করে দিল ইউল্যাব সংস্কৃতির সাথে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. জহিরুল হক এর স্বাগত বক্তব্যর মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠানের। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ইউল্যাব এর রেজিস্ট্রার লেঃ কর্নেল (অবঃ) ফয়জুল ইসলাম, ইংলিশ এন্ড হিউম্যানিটিস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর মুহিত-উল-আলম।

বেলা ১১ টায় বিজনেস ক্লাব এর সদস্য মুনিশ মন্ডল এর "হঠাৎ দেখা" আবৃত্তির মাধ্যমে শুরু সাংস্কৃতিক আয়োজন। এরপর মঞ্চে আসেন ক্লাবের জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সংগীত শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এর উপদেষ্টা শায়েখ সালেহিন বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গি'র মাধ্যমে ইংরেজী শব্দ শেখার উপায়ে সবাইকে আলোকিত করেন। পরে ইউল্যাব মিডিয়া ক্লাব থেকে পারফর্ম করে আব্দুল্লাহ আল মোর্শেদ ও আল নাহিয়ান। তাদের নাটক "একদা তাহারা" উপস্থাপিত হয় হাসি-ঠাট্টা আর তর্কের মাধ্যমে। একই ক্লাব থেকে নৃত্য প্রদর্শন করে অন্তু ও সামিয়া।

এর পর দেখানো হয় ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব এর অভিনব নানা রঙের বাতি নিয়ে খেলা ও সমাজ সচেতনতামূলক একটি তথ্যচিত্র। সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ক্লাব নিয়ে আসে তাদের কর্মকাণ্ড নির্ভর একটি মঞ্চ উপস্থাপনা ও তথ্যচিত্র 'অতঃপর জীবন' এর প্রদর্শন। এরপর আয়োজনে অংশ নেয় ইউল্যাব সংস্কৃতি সংসদ, ইটিই ক্লাব, ফিল্ম ক্লাবসহ অন্যান্য ক্লবের সদস্যবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীদের মনন ও মেধার বিকাশে ক্লাব কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন তাদের বক্তব্যে। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনায় ছিলেন মাহবুবা সুলতানা এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ক্লাব সমন্বয়কারী ও ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র লেকচারার তাহমিনা জামান।

বিদায়ের আগুনে ,আগামীর শপথ

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

বিদায় এক অনিবার্য বিষয় । কিন্তু এই সাধারণ আর নিয়মিত ব্যাপারটা কখনও কখনও সবার কাছে আর সাধারন থাকে না। হয়তো তখন সেটা অনেকটা বিশেষ কিছু হয়ে যায়। ২০১০ এর ফল সেমিস্টারে যে এক ঝাঁক উদ্যমী মেধাবীদের আগমন ঘটেছিল ইউল্যাব-এ তাদেরও চলে যেতে হল প্রিয় ক্যাম্পাস ছেড়ে।

ব্যাচ-১০১ ইউল্যাবকে যতটুকু দিতে পেরেছে, সেটাই বা কম কিসে! পাঁচ পাঁচটি ক্লাবের সভাপতি আর চারটি ক্লাবের সাধারন সম্পাদকতো এই ব্যাচ থেকেই! অগণিত মেধাবীদের চেষ্টা, দক্ষতা, সময় আর পরিশ্রম ইউল্যাবের সন্মান বৃদ্ধি করেছে বরাবরই। সেটা যেমন পড়াশোনায়, ঠিক তেমনি অন্যান্য কর্মদক্ষতায়।

গত ২০ আগস্ট, ১০১ ব্যাচের ইউল্যাবিয়ানদের জন্য অন্যরকম একটা দিন। চিরচেনা ইউল্যাব সেদিন সেজেছিল অন্য এক সাজে। ক্যাম্পাসে প্রবেশের গেট-লবি সব জায়গায় এক ধরনের ধরণের শূন্যতার কান্না। কারণ সেদিন ছিল ১০১ ব্যাচের 'লাস্ট ডে অ্যাট ইউল্যাব'।

'লাস্ট ডে অ্যাট ইউল্যাব'-এর প্রথম পর্ব শুরু হয় সকাল সাড়ে ১১টায়। ইউল্যাবের প্রো ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এইচ এম জহিরুল হক ও রেজিস্টার লেঃ কর্নেল ফয়জুল ইসলাম (অবঃ); মিলিতভাবে কেক কেটে ইউল্যাব লবিতে এর উদ্বোধন করেন। অতঃপর শুরু হয় ১০১

>> পৃষ্ঠা ৩, কলাম ১

লক্ষ্য জয়ের পর ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের একদল উচ্ছসিত সদস্য

ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব

লেটস হ্যাভ আ রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার

প্রমা সঞ্চিতা

"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা; মনে মনে।" রবি বাবুর মত কল্পনায় নয়। এ যেন সত্যি সত্যি হারিয়ে যাবার পালা। নাগরিক জীবন ছেড়ে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে। ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতি সেমিস্টারের শেষেই শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হয়ে থাকে একটি অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরের। এ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অন্যান্য ট্যুরের চেয়ে বরাবরই আলাদা। সব ধরনের আরামপ্রিয়তা থেকে দূরে থেকে কষ্টকর ও প্রতিকূল অবস্থার সাথেও মানুষ কিভাবে মানিয়ে নিতে পারে সে শিক্ষাই পাওয়া যায় এ অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরগুলোতে।

অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের সর্বশেষ ট্যুরটি ছিল নিঝুমদ্বীপ-এ। গত ৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রায় ৮০ জন সদস্যের একটি দল নিয়ে নিঝুম দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে চাঁদপুরগামী একটি লঞ্চ। এই ট্যুরে ক্লাবের ৭৭জন সদস্য ছাড়াও ছিলেন ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের অ্যাডভাইসর মেহেদী রাজিব, স্টুডেন্ট'স অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার নেদা সাকিবা এবং লজিস্টিক স্পন্সর ওএলএফ-এর রিমন খান। ট্যুরটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মারজানা ফেরদৌসি, জেনারেল সেক্রেটারি তানভীর মেহেদী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুরজিৎ বিশ্বাস, ফিন্যান্স সেক্রেটারি আরাফাত হোসেন , পাবলিকেশন সেক্রেটারি প্রমা সঞ্চিতা ও ক্লাবের অ্যাডভাইসর মেহেদী রাজিব।

এবারের ট্যুরটি ছিল ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাব ও ডিইএ বা ডিউক অব এডিনবোরা অ্যাওয়ার্ড-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত। ডিউক অব এডিনবোরা অ্যাওয়ার্ডটি প্রদান করা হয়ে থাকে ব্রিটিশ রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে। এই অ্যাওয়ার্ডের চারটি শর্ত যারা পূরণ করতে পারবে শুধু তাদেরকেই এই পুরস্কারটি দেয়া হয়। যার অন্যতম একটি হল ভ্রমণ।

চারদিন ও পাঁচ রাত্রির এই চমৎকার ভ্রমণে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি অংশ নিয়েছে বেশ কিছু শিক্ষামূলক কাজেও। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত তাবুতে থাকতে দেয়া হয়েছে এবং সেটি কিভাবে তৈরি করতে হয় তাও তাদেরকে শেখানো হয়েছে। এছাড়াও ৮টি দলে ভাগ হয়ে সবাইকে তাদের জন্য নির্ধারিত দলগত কাজগুলোও করতে হয়েছে।

এবারের ট্রিপের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় অংশটি ছিল হরিণ দেখতে যাওয়া। কাদা-মাটি ও লতা-পাতার আবরণে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে হয় হরিণের দেখা পাওয়ার অপেক্ষায়! ভাগ্য ভালো হলে দেখা মেলে হরিণের, নইলে নয়। অনেক সাধ্য-সাধনা করে আমরা দেখা পেয়েছিলাম সেই সোনার হরিণের! এই ট্যুরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো পরিবেশের কোনো পরিবর্তন বা ক্ষতি না করে খুব কাছ থেকে প্রকৃতিকে দেখা ও অনুভব করা।

সব মিলিয়ে শিক্ষা ও রোমাঞ্চে ভরপুর চমৎকার চারটি দিন কাটিয়ে ১৩ তারিখ সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ইউল্যাব অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের প্রাণোচ্ছল ও উদ্যোমী তরুণ-তরুণীর দল। পেছনে পরে থাকে স্বপ্নের নিঝুম দ্বীপ।

পোশাক হাতে একদল ছিন্নমূল শিশুর সঙ্গে ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের কয়েকজন সদস্য

২ পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

মানুষ হওয়া

অপেক্ষায় করছে। মানুষটা কি শেষ পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারবে নাহ! কাল বাদে পরশু দিনই যে ঈদ! মানুষটা কি শেষ পর্যন্ত তার আপনজনদের সাথে ঈদ করতে পারবে না! এসব কথা ভাবতে ভাবতে সুব্রতর মাথা আরও ঘুরতে লাগল।

এদিকে তখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলতে শুরু করেছে। ইফতারিরও সময় হয়ে যাচ্ছে। সুব্রতর তখন হটাৎ মনে হল, বৃদ্ধা হয়তো ইফতারিও করতে পারবে না! আশেপাশে তাকাতেই সে এক কনফেকশনারী দোকান দেখতে পেল। সেখান থেকে ২টা বড় বনরুটি আর ১ লিটারের পানির বোতল কিনে সুব্রত বৃদ্ধার খোঁজে ছুটতে লাগল।

৭ম খণ্ড

সুব্রত, যেখানে রেখে গেছিল সেখানেই বৃদ্ধাকে খুঁজে পেল। খানিকটা স্বস্তি পেলেও সুব্রতর চিন্তা তখনও কমেনি, যেন আর বাড়ল। বৃদ্ধার হাতে রুটি আর পানি তুলে দিয়ে, সুব্রত আবার বাসের খোঁজে নেমে পড়ল। অবশেষে সুব্রতর দৌড়ঝাপ সফল হল। কিছু যাত্রীর সহযোগিতা আর তার নিজের চেষ্টার ফলে নওগাঁগামী এক বাসের কন্ডাক্টার তার বাসে বৃদ্ধাকে নিতে রাজি হল। বিনিময়ে দিতে হবে দুই শত টাকা!

দরকষাকষি আর দেনদরবারের পর সুব্রত বাস কন্ডাক্টারকে ১০০ টাকাতে রাজি করাল। ইতিমধ্যে এক যাত্রী বৃদ্ধাকে ইফতারির ছোলা-মুড়ি কিনে দিয়েছে। হেলপারের সহযোগিতায় বৃদ্ধা ও তার বস্তা অবশেষে বাসে উঠল। তারপর সুব্রত নিজের বাসের ভাড়ার জন্য মাত্র ১৫ টাকা রেখে, বাকি সব টাকা বৃদ্ধার হাতে দিয়ে দিল। বাস থেকে নামার আগে বৃদ্ধা সুব্রতর জন্য দোয়া করল। এতে তার দাদীর কথা আরও ভাল ভাবে মনে পরে গেল। সুব্রত বলল, "আমার জন্য না, আমার বাবা-মা এর জন্য দোয়া করবেন। তাঁদের জন্যই আমি আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি।" সুব্রতর গলাটা ধরে এলো। সে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে পড়ল।

৮ম খণ্ড

মসজিদ থেকে আযানের সুর ভেসে আসছে। ইতিমধ্যে আশেপাশের সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ইফতারির হরেক আয়োজন নিয়ে। সুব্রত হাঁটতে শুরু করল। পর্বত সিনেমা হলের সামনে আসার পরে সে সাভারের জন্য বাস পেল।

বাসের সিটে বসার পরও সুব্রত সেই বৃদ্ধাকে ভুলতে পারল না। শেষ দৃশ্যের ছবিগুলো যেন তখনও তার চোখে ভাসছে।

সুব্রত মনে মনে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিল। এর ফাঁকে সুব্রতর অন্তরাত্মা বলে উঠল, "আকৃতিগত মানুষ থেকে, আজ অনেকখানি মানুষ হলাম"।

ছিন্নমূল পথশিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

বছরে দু'বার করে ঈদ আসে, আবার চলেও যায়। কিন্তু কিছু মানুষের জীবনে যেন ঈদ আসি আসি করেও সম্পূর্ণ অর্থে আসে না। বিশেষ করে ছিন্নমূল পথশিশুদের মাঝে। যারা ঈদের দিনেও পরিতৃপ্তিতে দু'মুঠো ভাত কিংবা সেমাই খেতে পারে না। ঈদের নতুন পোশাক যাদের পড়নে ওঠে না। তাদের ঈদের দিনটা তাই অন্য সাধারন দিনগুলোর মতই।

ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাব বরাবরই সমাজের এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন সময়। এরই ধারাবাহিকতায় এবার ঈদে তারা ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য কাজ করার সংকল্প নেয়। তারই পথ ধরে এ "পথশিশুদের মাঝে ঈদের পোশাক বিতরণ"। ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অবহেলিত এই শিশুদের মুখে শুধু ঈদের দিনের জন্য হলেও কিঞ্চিৎ হাসি ফোটানো।

গত ৮ আগস্ট ঈদের মাত্র এক দিন আগে ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সদস্যরা ইউল্যাব ক্যাম্পাস-এ এর ঠিক বিপরীতে ধানমন্ডি লেকের পাড়ে অবস্থিত 'ব্যাচেলর পয়েন্ট'-এ পাঁচ থেকে দশ বছর বয়সী পথশিশুদের মাঝে ৩২ সেট ঈদের নতুন পোশাক বিতরণ করে। ঈদের জন্য নতুন পোশাক পাওয়ার পরে ছোট্ট এই সব পথশিশুদের মুখে যে পরিমাণ খুশি লক্ষ্য করা যায় তা ছিল দেখার মত। ইউল্যাব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ক্লাবের সদস্যবৃন্দ এ সময় যেন তাদের আয়োজনের সার্থকতা খুঁজে পায়।

দ্য ভয়েজ অফ হোপ

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

"রোদ্দুর শুকিয়ে এঁকেছিলে তুমি সোনালি জীবনের ছাপ।" কথাটি একজন আলোকবর্তিকার প্রসঙ্গে অনায়াসে মিলে যেতে পারে। গণতন্ত্রের আপোসহীন নেত্রী অং সান সু চি নির্দ্বিধায় সে কাতারে স্থান পেতে পারেন। ইতিহাস বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের গনতান্ত্রিক পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে আসছে। কোন কোন সময় তাদের ভিন্ননামেও ডাকা হয়েছে। এক্ষেত্রে অং সান সু চি'র অতি সৌভাগ্য। তাঁর গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্য করা আন্দোলন হিসেবেই মূল্যায়িত হয়েছে সমগ্র বিশ্বে।

"দ্য ভয়েস অব হোপ" অং সান সু চি তথা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য সংগ্রাম করা মানুষদের এক জীবন্ত দিনপঞ্জি। অং সান সু চি'র সাথে অ্যালান ক্লেমেন্টস-এর সাক্ষাৎকারের উপরে ভিত্তি করে রচিত এ বইটিতে একদিকে যেমন অং সান সু চি'র নিজস্ব বিশ্বাস, প্রজ্ঞা ও দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে, ঠিক তেমনি মায়ানমারের জনগণের উপর পরিচালিত পরাধীনতার নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিবরণও বর্ণিত হয়েছে। অং সান সু চি'র ভাষায়, "সারা বিশ্বকে জানিয়ে দিন আমরা এখনও আমাদের নিজ বাসভূমে কারাবন্দি।"

"মানুষ বাঁচে তার আশার সমান", আশা হল মানুষের অন্তর্নিহিত প্রানশক্তি। অং সান সু চি হলেন মায়ানমারের স্বাধীনতাকামী মানুষদের সেই প্রানশক্তি। দেশের জনগণের দৈনন্দিন মুক্তি তথা স্বাধীনতার জন্য বছরের পর বছর সামরিক জান্তা গৃহবন্দী রেখেছে তাকে। তবু এক চুল নড়েননি তার আন্দোলনের পথ থেকে। কারাগারে থেকেও মুক্তির পথ খুঁজেছেন, করেছেন স্বপ্ন বিনির্মাণ। তাই তিনি সত্যিকার অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন মায়ানমারের গনমানুষের 'আশার কণ্ঠস্বর'। গান্ধীবাদের অহিংসনীতিতে সংগ্রাম করে চলা এ মহীয়সী নারীর কণ্ঠস্বর ও উপস্থিতি সবসময়ই দারুণভাবে আশা জাগায় মায়ানমারের নির্যাতিত মানুষদের মনে। ফলস্বরূপ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত জান্তা সরকার বারবার এ নেত্রীকে জনগণের কাছ থেকে দূরে রাখার জন্য বছরের পর বছর ধরে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখে, যার প্রথম দফায় ছিল ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সাল, দ্বিতীয় দফায় ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। ২০০৯ সালে গৃহবন্দী চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগে তাঁর গৃহবন্দী সময়ের মেয়াদ আর ১৮ মাস বাড়ানো হয় এবং ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

অং সান সু চি, গণতন্ত্রের জন্য করা তাঁর ও তাঁর দেশের এ সংগ্রামকে 'আকি বিপ্লব' বলে অবহিত করেন। এ বিপ্লবকে অ্যালান ক্লেমেন্টস তুলনা করেছেন 'দক্ষিণ আফ্রিকার মিরাকল' কিংবা 'রোমানিয়ার নিকলাই চসেস্কুর দ্রুত পতন' কিংবা ভেক্রেভ হ্যাভেলের 'ভেলভেট রেভুলেশন অব চেকোস্লোভাকিয়া' এর সঙ্গে। অ্যালান ক্লেমেন্টস, তার

>> পৃষ্ঠা ৪, কলাম ৩

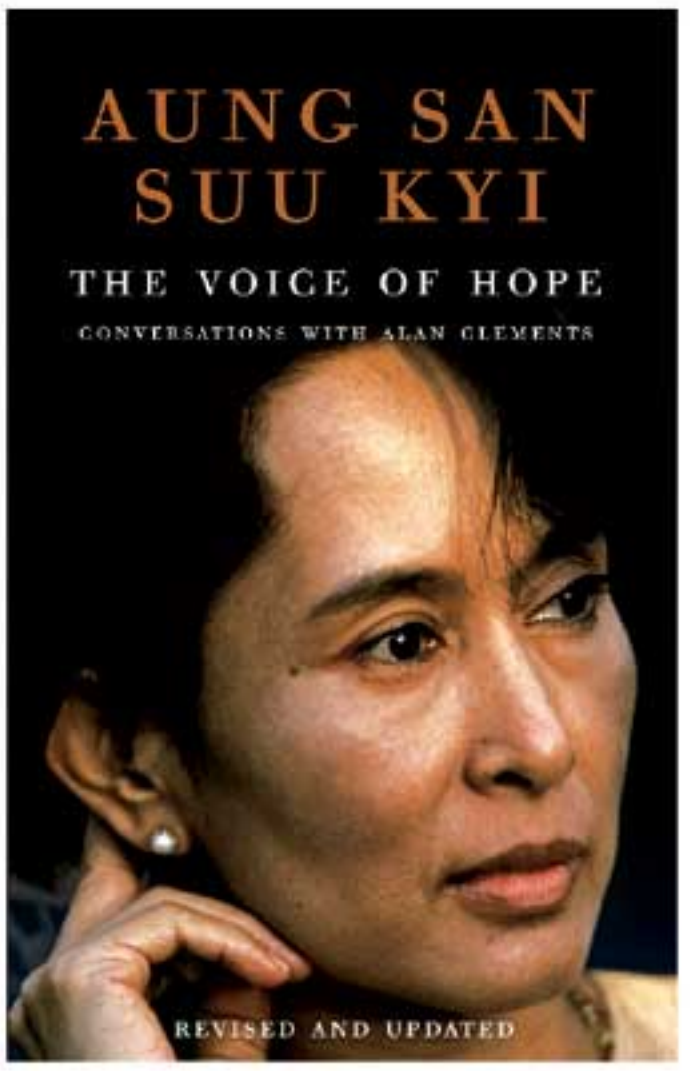

ভিজোনটেলে VS. টেলিভিশন

জাহিদ গগন

মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী ইতিমধ্যে একজন মেধাবী এবং নন্দিত পরিচালক হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন অনেকের কাছে। তার একাধিক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রশংসাও কুড়িয়েছে। তার সর্বশেষ ছবি 'টেলিভিশন'। কিন্তু বিতর্ক উঠেছে চলচ্চিত্রটির মৌলিকত্ব নিয়ে। সে বিতর্কেরই সমাধান খুঁজেছেন নবীন চলচ্চিত্র বিশ্লেষক জাহিদ গগন...

তুর্কি সিনেমা তেমন একটা দেখা হয়না, কিন্তু সাম্প্রতিককালে মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর 'টেলিভিশন' সিনেমা রিলিজ পাওয়ার পর অনেকে বলা শুরু করে, এটা তুর্কি সিনেমা 'ভিজোনটেলে'র নকল বা কপি-পেস্ট। আমি 'টেলিভিশন' দেখেছিলাম, আর সেদিন 'ভিজোনটেলে' দেখার পর মাথার ভিতর যে ডায়লগগুলো গেঁথে গিয়েছিল, তার মধ্যে ১টি ছিল 'ভিজোনটেলে' সিনেমার মেয়রের:

'Newspapers arrive here two days late. By the time we hear something, people have forgotten about that.'

শুরুতে 'ভিজোনটেলে' সিনেমা সম্পর্কে একটু বলি। 'টেলিভিশন' বা 'ভিজোনটেলে' সিনেমার প্লট তুরস্কের একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। সময়কাল ৭০ দশকের শুরুর দিকে, যখন সেই গ্রামের কেউ টেলিভিশন দেখেনি। তারা কেউ জানেও না তখনও বস্তুটা দিয়ে কি হয়। কেউ কেউ ভাসা ভাসা কথা বলে, আর মেয়র টেলিভিশন মানে বুঝেন ছবি-যুক্ত রেডিও। সময়টা যুদ্ধের। এটা এমন একটি সময় যখন গ্রামে পেপার আসে দুইদিন দেরী করে; তারা যখন কোন খবর পায় তখন রাজধানী ইস্তামবুলের মানুষ সেটা ভুলে যায়। গ্রামে রেডিও বাদে বিনোদনের আরেকটি মাধ্যম হল সিনেমা, যেখানে একি সিনেমা সপ্তাহের পর সপ্তাহ দেখানো হয়। সিনেমা হলের সামনে তরমুজওয়ালা সিনেমার ডায়ালগ শুনতে শুনতেই মুখস্থ করে ফেলে। লতিফ নামের এক লোক ঐ হলের মালিক যার সাথে মেয়রের আবার ঠান্ডা সম্পর্ক।

মূল ঘটনা হল - যুদ্ধের সময় বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি গ্রাম থেকে তরুণ-যুবকদের স্বেচ্ছাশ্রম করতে হয়। মেয়রসহ তার ছেলেরা সবাই স্বেচ্ছাশ্রম করেছে। বাকী ছিলো তার ছোট ছেলে রিফাত। সিনেমার শুরুতেই রিফাতের কল আসে। সে ইস্তানবুলের পথে রওয়ানা হয়। যাওয়ার সময় তার প্রেমিকা আসিয়াকে বলে যায় অপেক্ষা করার কথা। মেয়রের স্ত্রী ছেলেকে যেতে না দিলেও মেয়র গর্ব করেই ছেলেকে পাঠায়। একদিন গ্রামে ইস্তানবুল থেকে টেলিভিশন আসে, যেটা সম্পর্কে গ্রামে কারো কোন ধারণা নেই। এদিকে টিভি আসলে সবাই ফ্রী নাটক-সিনেমা দেখতে পাবে আর তাই লতিফের সিনেমা হল ধ্বসের মুখে পড়বে। এ আশংকায় লতিফ এর বিরোধীতা করে। মেয়রের বাসার সামনেই কাকতালীয়ভাবে অ্যান্টেনায় নিজেদের চ্যানেল ধরা পড়ে। মেয়র সবাইকে নিজের বাসায় দাওয়াত দেয়। সবাই আসলে মেয়র বিসমিল্লাহ বলে টিভি অন করেন। শুরুতে দেখা যায় একজন খবর পড়ছে। যুদ্ধে সম্প্রতি যে ৩ জন মারা গেছে তাদের নাম ও ছবি দেখানো হয় টিভিতে। সর্বশেষ মৃত ব্যক্তির নাম হলো রিফাত।

মেয়রের বাসায় আর টিভি চলেনা। মেয়র কাজ কর্ম ফেলে মদ নিয়ে পড়ে থাকে। সিনেমা হলে সিনেমা চলতে থাকে। একদিন মেয়রের স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করে তার ছেলে কোথায়! মেয়র উত্তর দেয় যে তার ছেলেকে সাইপ্রাসেই কবর দেয়া হয়েছে। এটা শুনে মেয়রের স্ত্রী টিভির দিকে দৌড়ে যায়। সে বুঝানোর চেষ্টা করে যে রিফাতের মৃত্যুর জন্য টেলিভিশনের কোন দোষ নেই।

এ হলো মোটামুটি 'ভিজোনটেলে' বা তুর্কি 'টেলিভিশন' সিনেমার কাহিনী। এবার দেখা যাক বাংলাদেশের 'টেলিভিশন' (২০১৩) সিনেমার কাহিনী সংক্ষেপ কি ?

সিনেমাটি শুরু হয় একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। টেলিভিশন চ্যানেল 'বাংলাভিশন' এর এক মহিলা সাংবাদিক একজন গ্রামের চেয়ারম্যানকে তার ধর্মীয় বিধিনিষেধ নিয়ে প্রশ্ন করছে। চেয়ারম্যান যতটুকু পারেন উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমেই চেয়ারম্যানের নানা কীর্তি প্রকাশিত হয়। তিনি তার গ্রামের মানুষদের টিভি দেখতে দেন না, মোবাইল ব্যবহার করতে দেন না, জন্ম নিয়ন্ত্রণ করতে দেন না। এ সমস্তের পেছনে তিনি মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 'কোরআন' এর যুক্তি দেখান। তাই তাঁর গ্রামে পত্রিকা পড়া হলেও সেখানে প্রকাশিত ছবিগুলো ঢেকে রাখা হয়। এতে তার ঈমান অক্ষুণ্ন থাকে। চেয়ারম্যানের ছেলে সোলাইমানের সাথে মালয়েশিয়া প্রবাসীর মেয়ে কোহিনূরের প্রেম। আবার সোলাইমানের তত্ত্বাবধানে চাকরি করা মজনু কোহিনূরকে পছন্দ করে। কিন্তু তাকে এখনো মনের কথাটা বলতে পারেনি। পরবর্তীতে সে বললেও কোহিনূর তাকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু সে হাল ছাড়ে না। সে নানাভাবে কোহিনূরের সামনে হাজির হয়, বারবার তার মনের কথা বলার চেষ্টা করে। আবার এ মজনুর বুদ্ধির জোড়েই সোলাইমান হাতে একটা মোবাইল পায় এবং সারা গ্রামের যুবকরা মোবাইল ব্যবহারের অনুমতি পায়। সিনেমাতে এ 'মজনু' চরিত্রটি একদিক থেকে মনিবের প্রতি অনুগত থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সুবিধার জন্য ভোল পাল্টাতেও দ্বিধাবোধ করত না। একারণে তাকে খানিকটা রহস্যময় বলেই মনে হয়।

গ্রামের এক হিন্দু, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক কুমার বাবু একদিন গ্রামে একটি টিভি নিয়ে হাজির হয়। চেয়ারম্যানের নিষেধ সত্ত্বেও টেলিভিশন আনার কারণ জিজ্ঞেস করলে - কুমার বাবু বলে যে তার ধর্মে তো টেলিভিশন নিয়ে কোন কিছু লেখা নেই। তাই সে ইচ্ছে করলে তা ব্যবহার করতে পারে। চেয়ারম্যান তা মেনে নেন ঠিকই কিন্তু তৎক্ষনাৎ কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। পরবর্তীতে মসজিদের ইমামের পরমার্শে ঠিক হয়, কুমার বাবু টিভি দেখতে পারবেন ঠিকই কিন্তু কোন মুসলমানকে তা দেখানো যাবে না। যদি মুসলমানেরা দেখে এবং তা চেয়ারম্যানের কান অব্দি পৌঁছায়, তবে বিচার বসানো হবে। তাতে দর্শকের পাশাপাশি কুমার বাবুরও উপস্থিত থাকতে হবে। এ মর্মে সে টিভি নিয়ে বাসায় যায়। কিন্তু লোকেদের আটকানো যায় না। তারা বাসা'র জানালা দিয়ে ভিড় করে টিভি দেখত। ছোট ছোট ছেলেরা 'প্রাইভেট' পড়ার নাম করে কুমার বাবুর বাসায় চলে আসত যাতে কোনভাবে টিভি দেখা যায়। একারণে পরে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকেরা চেয়ারম্যানের কাছে বিচার নিয়ে যায়। চেয়ারম্যান কুমার বাবুর বাসায় গিয়ে সব কিছু দেখেন এবং ঠিক করেন কুমার বাবুকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে টিভিটা নদীর পানিতে ফেলে দেওয়া হবে। সেখানে তিনি কোহিনূরেরও দেখা পান, যে কিনা টিভি দেখার জন্য সেখানে গিয়েছিল। কোহিনূরকে পরবর্তীতে চেয়ারম্যান কানে ধরে সবার সামনে উঠ-বস করান। এতে সে প্রচণ্ড অপমানিত হয় এবং সোলাইমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। সোলাইমান বিচ্ছিন্ন হবার দুঃখে মদ ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। কাজেই সে সারাক্ষণ বিষণ্ন হয়ে থাকে। ঠিক এ সময়ে মজনু কৌশলের সাথে জানান দেয় যে সে কোহিনূরকে ভালবাসে। সোলাইমান তা বুঝতে পারে না। মজনু তাকে পরামর্শ দেয় যাতে সে আরেকটা মেয়ে ধরে। কারণ জীবনে কত 'কোহিনূর' যাবে আসবে! কিন্তু সোলাইমান তা মানতে পারে না। তাই পরে সে নিজ উদ্যোগে যায় কোহিনূরের কাছে যাতে সে সব ভুলে গিয়ে আবার ঠিক হয়ে যায়। কোহিনূর এবার শর্ত দেয় যে তাকে বিয়ে করতে হলে সোলাইমানকে তার বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। গ্রামে টেলিভিশন আনতে হবে। তাদের বিয়েতে টেলিভিশন আনতে হবে। গ্রামের সবাই দেখবে। তবেই তার সুখ! সোলাইমান প্রাথমিকভাবে তার প্রতিবাদ করলেও পরে ঠিকই বাবার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । অন্যদিকে চেয়ারম্যান ঠিক করেন যে এবার তিনি হজ্বে যাবেন। আগে তিনি চাইলেও যেতে পারেননি, কারণ তার প্লেনে চড়তে বেশ ভয় করে। এবার তিনি বুঝতে পেরেছেন যে এটা আসলে 'শয়তান' এর চাল। কাজেই তিনি এ ভয়কে জয় করে হজ্বে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো হজ্বে

>> পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

একটি আকস্মিক বিদায়

জাহিদ গগন

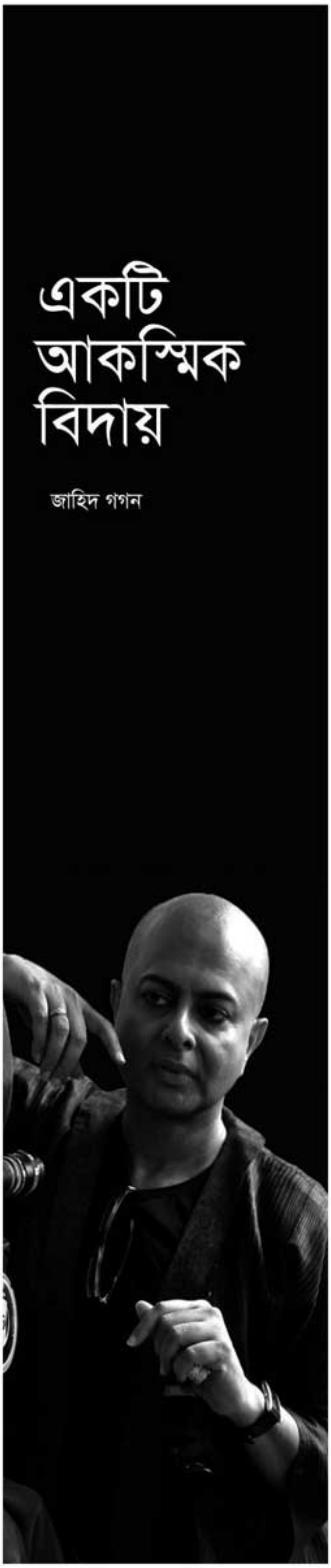

শেষ দৃশ্য। ক্যামেরার ফ্রেমে দেখা যাচ্ছে - অস্পষ্ট আলোময় একটি ঘরে একজন মানুষ বিছানায় ঘুমুচ্ছে। ক্যামেরা ধীরে ধীরে জুম হচ্ছে মানুষটার মুখ ফোকাস করে। অসীম নীরবতার মাঝেও কেমন যেন একটা অগভীর নিঃশ্বাসের শব্দ। হঠাৎ মানুষটি নড়তে শুরু করল। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই নড়াচড়াটা ছটফট এর পর্যায়ে পৌছালো। ঘামাতে শুরু করল মানুষটা। ছটফটানির চূড়ান্ত মুহূর্তে ঘড়িটাও অতিনির্বদ্ধতার সঙ্গে টিক টিক শব্দ করতে শুরু করল। একপর্যায়ে ফুসফুস থেকে অনেকগুলো বাতাস একত্রে বেরিয়ে ঘড়ির অতিকায় সেই টিক টিক শব্দকে মিলিয়ে দিল অসীম শূণ্যতায়...।

এটা কোন সিনেমার শেষ দৃশ্য নয়। ঋতুদা'র জীবনের শেষ দৃশ্য এটি, যা কিনা গত ৩০ মে সকালবেলা ধারণকৃত। ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন এ চলচ্চিত্র গুণধর। 'ঋতুদা', মানে ঋতুপর্ণ ঘোষ - চলচ্চিত্র পরিচালক, কাহিনীকার, লেখক, অভিনয় শিল্পী। মোদ্দা কথা চলচ্চিত্র প্রেমী। টালিউডে ঋতুপর্ণ ঘোষ পরিচিত ছিলেন এ 'ঋতুদা' নামেই। ১৯৬৩ সালের ৩১ আগস্ট জন্ম তাঁর। বাবা নিজেও তথ্যচিত্র তৈরী করতেন। ফলে চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অবধারিত। তবে কলকাতা সাউথ পয়েন্ট স্কুল থেকে পাস করে পড়াশোনাটা শেষ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি নিয়ে। এর পরই বিজ্ঞাপণ চিত্র তৈরি করতে করতে শেষঅব্দি চলচ্চিত্রে চলে আসা।

সত্যজিৎ পরবর্তী যুগে যে ক'জন চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যিকার অর্থেই সিনেমার ভাষাটা বুঝেছিলেন তাদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা অন্যতম। শেষদিকে লোকে ঋতুপর্ণকে চিত্রাঙ্গদা নামেই ডাকত। 'চিত্রাঙ্গদা' - তার সর্বাধিক আলোচিত ও সমালোচিত ছবি, যেখানে তিনি নামভূমিকায় অভিনয় কারিশমা দেখিয়ে ৬০তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার উৎসবে বাগিয়ে নিয়েছেন বিশেষ জুরি পুরস্কার। সত্যি বলতে, ছবির যেকোন চরিত্র নিয়ে একটা ম্যাজিক তৈরি করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ঋতুদা'র। আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের একজন বড় মাপের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ১৯ বছরের বর্ণাঢ্য চলচ্চিত্র জীবনে ঋতুপর্ণ ঘোষ ১৯টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেছেন যা প্রমাণ করে তার পরিশ্রম, প্রতিভা ও মেধার প্রগাঢ়তা।

১২ বার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। তাঁর চলচ্চিত্রগুলো ছিল বিষয়বৈচিত্রে অতুলনীয়। মা-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্কের জটিলতা থেকে শুরু করে থ্রিলারও ছিল তাঁর ছবির বিষয়। বাংলা মূলধারার ছবি যখন মূলত গ্রামীণ দর্শকদের কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছিল। তখন ঋতুপর্ণ শহুরে মধ্যবিত্তকেও আকৃষ্ট করে তোলেন সিনেমার জগতে। তাদের ভাবনাকেও চলচ্চিত্রের ভাষায় রুপান্তর করলেন। ১৯৯২ সালে ঋতুপর্ণ তৈরি করলেন তাঁর প্রথম ছবি 'হীরের আংটি'। এরপর ১৯৯৪ সালে বানালেন 'উনিশে এপ্রিল'। সত্যজিৎ রায়ের 'জলসা ঘর' হতে অনুপ্রাণিত হয়ে বানানো এই ছবিতে দেখানো হয়েছে একজন মা এবং মেয়ের মধ্যকার মানসিক, আবেগগত এবং স্নায়ুবিক চাপের উপাখ্যান। ছবিটি পরের বছর ঘরে তুলল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার।

এরপর ঋতুপর্ণ তৈরি করলেন তাঁর সবচেয়ে প্রশংসিত ছবি 'দহন'- যেখানে শাশ্বত বাঙ্গালী মধ্যবর্তী পরিবারগুলোর সামাজিক অভাবগুলো ফুটে উঠেছে নিদারুণ গভীরতায়। এরপর ঋতুপর্ণ একে একে তৈরী করলেন 'বাড়িওয়ালী', 'অসুখ', 'নৌকাডুবি', 'উৎসব', 'খেলা', 'শুভ মহরত' ও 'চোখের বালি'। বাংলা সাহিত্যে শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা কাহিনীর নায়ক ব্যোমকেশ বকশি দারুণ জনপ্রিয়। ঋতুপর্ণ তাঁর শেষ ছবিটি করছিলেন ব্যোমকেশের গোয়েন্দা কাহিনী অবলম্বনেই। খোদ নিজেই কি কখনো কল্পনা করেছিলেন জীবনের শেষ ছবির নাম হবে 'সত্যান্বেষী'? ছবিটির শ্যুটিং শেষ করে গেলেও আর মুক্তি দিয়ে যেতে পারেননি ঋতুপর্ণ ঘোষ। শুধু তাই নয়, তিনি ভাওয়ালের রাজাকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের ছবিও করতে চেয়েছিলেন।

একটি মাত্র ইংরেজী ছবি করেছেন। অমিতাভ বচ্চন ও প্রীতি জিন্তা অভিনীত ছবিটির নাম 'দ্য লাস্ট লিয়ার'। দুটো হিন্দী ছবিও তৈরি করেছেন। প্রথম 'রেইনকোট' করেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং অজয় দেবগণকে নিয়ে এবং পরবর্তীতে 'সানগ্লাস' তাঁকে এনে দিয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১২। দুটি সেলিব্রেটি শো উপস্থাপনা করেছেন - 'এবং ঋতুপর্ণ' ও 'ঘোষ অ্যান্ড কোং' নামে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েছেন কৌশিক গাঙ্গুলী'র 'আরেকটি প্রেমের গল্প' ও সঞ্জয় নাগ-এর 'মেমোরিস ইন মার্চ' ছবি দুটোয়। তবে তারও আগে উড়িয়া ছবি 'কথা দেইথিলি মা কু (মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি)' ছবিতে প্রথম অভিনয় করেছেন ২০০৩ সালে। তাঁর শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'চিত্রাঙ্গদা'তে তো করেছেনই। অধিকন্তু, বাংলা ছবির প্রসারেও ঋতুপর্ণ ঘোষ ছিলেন সোচ্চার। তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ছবিকে এক প্ল্যাটফর্মে আনতে। আলাদাভাবে গড়তেও চেয়েছিল দুই বাংলার ছবির একটি ভিন্ন জগৎ। চেয়েছিলেন দুই বাংলার ছবির বিনিময়। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন বাংলা ছবিকে। গড়তেও চেয়েছিল বাংলা ছবির বিশ্ববাজার। সেই লক্ষ্যে এগিয়েও ছিলেন ঋতুপর্ণ। সাড়াও পেয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে। গত ফেব্রুয়ারীতে দুই বাংলার কয়েকজন প্রথিতযশা চলচ্চিত্রশিল্পীকে সাথে নিয়ে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সাথে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু সে স্বপ্ন আর সফল করে যেতে পারলেন না।

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ঋতুপর্ণ জনপ্রিয় ম্যাগাজিন আনন্দলোক এবং সংবাদ সাময়িকী'র ক্রোড়পত্র 'রোববার' এর সম্পাদক ছিলেন। তাঁর নক্ষত্রোজ্জ্বল কলামগুলো দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল এবং ব্যাপক অনুসরণীয় ছিল পাঠকদের কাছে। মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানাতে কমতি করিনি আমরা এ মহান মানুষটিকে। কিন্তু এ শ্রদ্ধাঞ্জলীর ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে, কী কী যেন শোনা যায়। চারপাশে কিসের যেন গুঞ্জন, কানাকানি। কান না পেতেও কানে আসে- "ঋতুপর্ণ ঘোষ কী পুরুষ ছিল নাকি নারী? নাকি নারী-পুরুষ দুটোই ছিল? তবে কী হিজড়ে ছিল ঋতুপর্ণ?" কেউ কেউ তাঁকে সমকামীও বলেন। আবার অনেকে বলেছেন ট্রান্সজেন্ডার, পুরুষ থেকে রূপান্তরিত নারী। যার যা

অসীম নীরবতার মাঝেও কেমন যেন একটা অগভীর নিঃশ্বাসের শব্দ। হঠাৎ মানুষটি নড়তে শুরু করল। যেন দুঃস্বপ্ন দেখছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই নড়াচড়াটা ছটফট এর পর্যায়ে পৌছালো

খুশি বলছে, মন্তব্য করছে। রীতিমতো বিতর্ক চলছে, খুব ক্লিষে বিতর্ক, বিতর্ক স্রেফ ঋতুপর্ণর 'লিঙ্গ' নিয়ে!

ঋতুপর্ণ সমকামী না, রুপান্তরকামী না, হিজড়ে না, নারী না, পুরুষ না, ঋতু কোনোটিই না। ঋতু মানুষ ছিল। শুধু মানুষ। মানবিক একজন মানুষ। প্রচলিত জীবনের বোধ ও যৌনতার সীমারেখা অতিক্রম করে যে মানুষ দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। দাঁড়াতে পেরেওছিলেন যিনি। তিনিই ঋতুপর্ণ ঘোষ। শুধু এটুকুই কি যথেষ্ট নয়? বস্তুতপক্ষে শিল্পীর কোনো জেন্ডার হয় না। বরং জেন্ডারকে একমাত্র মহান শিল্পীরাই অতিক্রম করে যেতে পারেন।

ঋতুপর্ণর আবরণ ও আভরণ নিয়েও কথা উঠেছে। নিতান্ত মূর্খ না হলে বোঝা উচিত, ঋতুপর্ণ বেশ বছর কয়েক ধরেই ইউনিসেক্স পোশাক পড়তেন। যেটি কামিজ, সালোয়ার নয় প্যান্ট শার্ট নয়, আবার পাঞ্জাবি, পাজামাও বলা যাবে না তাকে। যেটি একান্তভাবেই 'ঋতুপর্ণর পোশাক', যা কেবল মানায় ঋতুপর্ণকেই।

প্রচলিত রীতি ও সংস্কার ভাঙা, যৌনতার কৃত্রিম সীমারেখা অতিক্রম করা মানুষ নিয়ে চিরকালই কুতর্ক হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাজ বদলায় না, দু'চার জনই বদলায়, ধাক্কা দেয়, থাপ্পর দেয় সমাজকে। রীতিমতো ভিত নাড়িয়ে দেয়।

ঋতুপর্ণ একটি যুগের নাম। তবে একটা যুগের পরিপূর্ণতা আনতে ঋতুপর্ণর হয়তো আরও ১৫-২০ বছর বেঁচে থাকার কথা ছিল। তাই সহজভাবে বলা চলে, বাংলা চলচ্চিত্রের আকাশে খানিকটা মেঘ উড়ে গেল বোধ হয়। খানিকটা নয়, অনেকটাই।

আশরাফুল এবং বিসিবি বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ

সজল বি রোজারিও

গত ৩১ মে সকালে পত্রিকা হাতে পেয়ে হয়তো অনেকেরই চোখ কপালে উঠেছে। বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের যেন স্তব্ধ করে দিল 'প্রথম আলো'র শিরোনাম। সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক উৎপল শুভ্র তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তুলে ধরলেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের বড় এক কালো অধ্যায়। ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুলের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রথমবারের মত সবার সামনে তুলে ধরে রীতিমত বোমা ফাটালেন।

ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার অভিযোগের তালিকায় আছেন আরও তিন ক্রিকেটার । এরা সবাই বাংলাদেশ ক্রিকেটের এক একজন রথী-মহারথী । খালেদ মাসুদ, মোহাম্মদ রফিক ও খালেদ মাহমুদ। বিপিএলের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ফিক্সিংয়ের ঘটনা প্রকাশ পেল। শুরু থেকেই বিপিএলকে সন্দেহ করা হচ্ছিল ফিক্সিংয়ের ঘাঁটি হিসেবে। নানা বিতর্কে জর্জরিত বিসিবি আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকও জড়িত ছিলেন বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

তিন প্রবীণ ক্রিকেটার ও ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিক ফিক্সিংয়ের ঘটনা অস্বীকার করেন। কিন্তু নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে সংবাদ সম্মেলনে কান্না জড়ানো মুখে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের ঘটনা স্বীকার করেন বাংলাদেশের ক্রিকেটে সবচেয়ে প্রতিভাবান বলে বিবেচিত মোহাম্মাদ আশরাফুল। এ সময়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আশরাফুল এবং বিসিবি'র বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যৎ। এ বিষয়ে কি ভাবছে তরুণ প্রজন্ম?

মৌমিতু জাহান নীলিমা

এমএসজে

আমার মনে হয় আশরাফুলকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। আইসিসি তদন্ত দল বাংলাদেশে এসেছিল মূলত বিপিএলের ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের একটি ম্যাচকে সন্দেহ করেই। সে ম্যাচে অধিনায়ক মাশরাফিকে খেলার আগে হঠাৎ করে বাদ দিয়ে আশরাফুলকে অধিনায়ক করা হয়। এ ম্যাচে ফিক্সিংয়ের ঘটনায় ঢাকা গ্ল্যাডিয়েটরসের মালিকই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এখানে তারা আশরাফুলকে অনেকটা জোড়পূর্বক ব্যবহার করেছে। এ ধরণের খেলায় মালিকের কথার বাইরে কিছু করা মানে দল থেকে বাদ পড়া। আশরাফুল তো তখন এমনিতেই ফর্মে ছিল না। জাতীয় দলে ফেরার জন্য বিপিএলে খেলাটা তার প্রয়োজন ছিল। আর আন্তর্জাতিক ম্যাচের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলবো সেখানেও আশরাফুলের দোষ কম; কারণ সে নিজ থেকে ফিক্সিংয়ে জড়ায়নি। ফিক্সিং জগতে তার প্রবেশের পিছনে সিনিয়র ক্রিকেটারদের অবদান ছিল। বিচার হলে সেসব খেলোয়াড় ও ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের আগে বিচার হওয়া উচিত।

সুজিত রাজবংশি

বিবিএ

আশরাফুল আমাদের অনেক প্রিয় একজন ক্রিকেটার। সে দেশের ক্রিকেটের আদর্শ। তার হাত ধরেই বাংলাদেশের ক্রিকেটের অনেক সাফল্য এসেছে। তার কাছ থেকে এ ধরণের কাজ কখনই আশা করিনি। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটে যেন এ ধরণের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য এখন থেকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বয়সভিত্তিক ক্রিকেট থেকেই খেলোয়াড়দের মধ্যে যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তরুণ বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভালো দিক-মন্দ দিক সম্পর্কে জ্ঞান না দিলে দেশের ক্রিকেটের উন্নতি কোন ভাবেই সম্ভব হবে না। আর এ ব্যবস্থা নিতে হবে বিসিবিকেই।

হাসনাত পিয়াস

এমএসজে

ফিক্সিং ক্রিকেট জগতে একটি বড় অপরাধ। এটা শুধুমাত্র ক্রিকেট নয় গোটা দেশের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা। এর আগেও অনেকেই ফিক্সিং করেছে । আশরাফুলের আগেই উচিত ছিল এই জগৎ থেকে সরে আসা। আশরাফুল যদি দোষী প্রমাণিত হয়, শাস্তি তাকে অবশ্যই পেতে হবে। একই সাথে তাকে ফিক্সিংয়ে যারা জড়িয়েছে তাদেরও খুজে বের করতে হবে। বিপিএল আয়োজনের জন্য বিসিবিকে আরও সতর্ক হতে হবে। বিপিএল ইতিমধ্যেই নানা রকমের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। বিদেশি খেলোয়াড়সহ দেশের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক তারা ঠিকমত পরিশোধ করছে না, এমন অভিযোগও শোনা যায়। তাছাড়া ফিক্সিংয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদেরও জড়িত থাকার কথা শোনা যাচ্ছে যা দেশের ক্রিকেটের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে।

মদিনা জাহান রিমি

এমএসজে

আমার মনে হয় আশরাফুলের সাথে অবিচার করা হয়েছে। বাংলাদেশের মিডিয়া তাকে হেয় করার চেষ্টা করেছে। যেখানে তাদের উচিৎ ছিল তার পাশে থাকা। বিসিবি'র উচিত ছিল আগে থেকেই এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। ফিক্সিংয়ে বাংলাদেশের জড়িয়ে পরার দায়ভার তাদেরও নিতে হবে। তবে আশরাফুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তো আমাদের কিছু করার নেই। ক্রিকেট বোদ্ধারাই এর বিচার করবে। তবে আমি চাইব আশরাফুলের যেন শাস্তি না হয়। এ ঘটনা তো আশরাফুল একা করেনি। এর পিছনে অনেক রুই-কাতলাও নিশ্চয়ই রয়েছে। আগে তাদের বিচার করতে হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে একজন আশরাফুলকে শাস্তি দিয়ে বাকিরা যদি অধরাই থেকে যায় তাহলে সমাধানটা হবে অস্থায়ী। ঠিকই সময়ের সঙ্গে আরও আশরাফুল জন্ম নেবে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে।

অতনু বিশ্বাস

বিবিএ

আশরাফুল এমন একজন ব্যাটসম্যান, যখন তার ব্যাটে রান এসেছে তখনই বাংলাদেশ জিতেছে। বড় বড় সব জয়ের পিছনে ছিল তার অবদান। এমন একজন খেলোয়াড় দেশের ক্রিকেট থেকে হারিয়ে যাবে তা কখনই আমরা চাইব না। অপরাধ সে স্বীকার করেছে, তাই শাস্তি অবশ্যই কম হওয়া উচিত। তবে ফিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে শুধু খেলোয়াড়দের শাস্তি দিলেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না। ফিক্সিংয়ে জড়িত অন্যান্য সব মানুষদের এবং জুয়াড়িদেরও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সাথে যেন জুয়াড়িরা যোগাযোগ করতে না পারে সে দিকে বিসিবি'র খেয়াল রাখতে হবে। তবে এটাও সত্যি, যত দাবিই একজন ক্রিকেট ভক্ত করুন না কেন; সমাধানের পুরোটাই নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার উপর। তাই যেকোনও সমাধান করার আগে প্রয়োজন দেশের ক্রিকেট অভিভাবকদের সেই সদিচ্ছাটুকুকে জাগিয়ে তোলা।

আহাদুল ইসলাম

বিবিএ

আশরাফুল বিশ্ব ক্রিকেটে বাংলাদেশের নামকে কলঙ্কিত করেছে। তার অবশ্যই কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার। একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমি চাইব তার শাস্তি যেন কম হয়। কারণ সে ভুল করার পর অপরাধ স্বীকার করেছে। তবে শাস্তি দিতে হবে, যেন ভবিষ্যতে ফিক্সিংয়ের দিকে আর কোন ক্রিকেটার জড়িয়ে না পড়ে। বিসিবি'র এখন থেকে আইন-কানুন বিষয়ে আরও বেশি নজর দিতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি খেলোয়াড়দের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। মোট কথা, একজন খেলোয়ার ঠিক কি কি কারণ ম্যাচ ফিক্সিংএর মতো জঘন্যতম অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

জয়িতা, কিছু মনে করো না

একটা-দু'টা -হাজার রিকশা, টুংটাং শব্দ
"মামা, সইরা খারান, লাইগা যাইব;" আর আমার
সরে দাঁড়াতে হয়, একবার-দু'বার, হাজার বার;
জয়িতা, কিছু মনে করো না
তোমাকে দেখা হয়নি কখনো,
হৃদয় দিয়ে বাসতে পারিনি ভালো,
এ শহর কেড়ে নিয়েছে আমার ডাহুক পাখির হৃদয়।

একটু দূরে শত বছরের বৃদ্ধের মত দীর্ঘ সময় ধরে
কেশে ওঠে বাস, হঠাৎ সিগন্যাল পড়ায় ব্রেক কষে,
আর স্বামী হারা নারীর মত করুণ আর্তনাদ করে ওঠে
রাস্তায় যত গাড়ি ছিল; ধুলো ওড়ে ধোঁয়ার মত,
ধুলোয় চারদিক ধূসর হয়, সকালে রোদ ওঠে যেমন
নদীর জলের বাস্প মিশে যায় ঘন কুয়াশায়;
জয়িতা, কিছু মনে করো না
তালের শাঁসের মত মুখখানা তোমার হয়নি দেখা,
মাটিতে ঝরে পড়া চাঁদের টুকরোর মত তোমাকে
কেন জানি পারিনি কখনো অনুভব করতে।

"মামা, দুইডা সিগারেট দিও, আর দুই কাপ চা,
দুধ-চিনি-পাত্তি বাড়াইয়া;" আমার তন্দ্রা কাটে,
হৃদয়ে যতটা তৈরি করেছিলাম খড়-কুটো দিয়ে
পাখির বাসা, সবটা ভেঙে যায় ঝড়ো বাতাসে।
আমি আর কি নিয়ে থাকবো?
যখন বুকের জলের কচুরিপানায় ফুল ফোটে না,
হঠাৎ করে শুকিয়ে যায় তিলে তিলে গড়া জল।

জয়িতা, কিছু মনে করো না
অমাবস্যার রাতে, গাব গাছে বসে থাকা
পাখির ডানার মত তোমার চুল দেখতে পাইনি;
নদীর জলে ভেসে থাকা শাপলা ফুলের মত তোমাকে
কখনো হয়নি দেখা, যখন এ শহর কেড়ে নিয়েছে
আমার নদীর উপর উড়ে যাওয়া পানকৌড়ি হৃদয়।

পিতৃপরিচয়হীন জারজ সন্তানগুলো দাঁড়িয়ে থাকে
রাস্তার পাশে, যেখানে দুর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনা, যেখানে
মানুষের প্রস্রাবের গন্ধ সেখানে, আমরা ভদ্র মানুষেরা
নাক ধরে রাস্তা পার হই আর "ওয়াক থু" বলে থুথু ফেলি;
আর ওখানেই ওদের বসবাস, ড্যান্ডির নেশা
দুর্গন্ধকে পরাস্ত করে ওদের দিয়েছে অপরিচিত নীল ভুবন।
তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিবাস্বপ্ন কেটে যায়,
দেখতে পাই, রাতের আকাশের অজস্র নক্ষত্ররাজি থেকে
খসে পড়ে একটি একটি করে উজ্জ্বল নক্ষত্র, আলো নিভে যায়।

জয়িতা, কিছু মনে করো না
এই যান্ত্রিকতায় ভরা শহরে দেখতে পাইনি
রাতের সমুদ্রের জলের গভীরতার মত তোমার চোখ,
যে চোখের ভেতর বনের নিস্পাপ পাখির মত মায়া।

গরম পিচের পথে পড়ে থাকে জ্বলতে থাকা সিগারেট
পুড়তে পুড়তে শেষ হয় স্পঞ্জ,
হতাশা নিয়ে পড়ে থাকে দীর্ঘ ছাই;
রাস্তায় পড়ে থাকে মানুষের কফ-থুথু, বিধ্বস্ত পুরুষ
গুঁড়া কৃমির যন্ত্রণায় পশ্চাৎ দেশে আঙুল ঢুকিয়ে চুলকায়
আর লালসা নিয়ে তাকায় পথের মেয়েদের শরীরে।
ইট-কংক্রিটের বৃষ্টিতে ভিজে ওঠে শহর, বৃষ্টি বাড়ে,
ঝড় শুরু হয়, মানুষগুলো ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে আসে,
উদ্বাস্তু অমানুষগুলো ছুটতে থাকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন।

জয়িতা, কিছু মনে করো না
শরতের সবুজ বনে হঠাৎ বৃষ্টির পর ঝলসে ওঠা
রোদের মত তোমার হাসি আর দেখা হলো না,
এ শহর কেড়ে নিয়েছে আমার সব; নদীর জলের গভীরে
ছোট্ট উদ্ভিদের মত মন, সুন্দর বনের মধ্যে বেড়ে ওঠা
মৌমাছি কিংবা প্রজাপতির মত এই ক্ষুদ্র হৃদয়।

■ সজল বি রোজারিও

মানুষ হওয়া

শুভ বসাক নিকুঞ্জ

১ম খণ্ড

তখন দুপুর সাড়ে তিনটা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, অবশেষে নীলক্ষেত মোড়ের দিকে হাঁটা শুরু করল সুব্রত। রমজান মাসের শেষের দিকে, এসময় সাধারণত নিউমার্কেটের সামনে থেকে বাসে খালি সিট পাওয়া যায় না। কি আর করা, নীলক্ষেত মোড়ই এখন ভরসা।

অবাক করা ব্যাপার! নীলক্ষেত মোড়ে আজ ধামরাই-গুলিস্তান রুটের কোন বাস নেই। মেজাজ খারাপ করে বাসের জন্য আরও সামনে এগিয়ে গেল সুব্রত। এখন সে আজিমপুর কলোনির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে।

বিকেল চারটা। আজ রাস্তায় ধামরাই-গুলিস্তান রুটের কোন বাসের দেখা নেই। না ডি-লিঙ্ক, না গ্রামীণ সেবা। মিরপুরগামী রাস্তা আজ যেন ২৭ নম্বর আর বিকল্প-বিহঙ্গের দখলে। সুব্রত পরিশ্রান্ত মনে আবার আজিমপুর কলোনির গেট থেকে নীলক্ষেত মোড়ের দিকে হাঁটা শুরু করল।

নীলক্ষেত মোড়ে পৌঁছানোর পর, হটাৎ সুব্রত কার যেন কান্নার করুণ সুর শুনতে পেল। মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকানো মাত্র দেখল এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। পড়নে তার ছেঁড়া শাড়ি, হাতে জীর্ণ ছাতা। পাশে মুখ বাঁধা একটা বস্তা। তার গলার করুণ স্বর অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এর মধ্যে কৌতূহলী বাঙ্গালীদের জটলা ঘিরে ধরল বৃদ্ধাকে। সুব্রতর এসবে কোন ভাবাবেগ নেই। রাস্তায় এমন ঘটনা কতই না ঘটে, এই নিয়ে এত চিন্তার কিই বা আছে!

২য় খণ্ড

বিকেল সাড়ে চারটা। এখনও সুব্রতর বাসের কোন দেখা নেই। কি মনে করে পিছনে তাকানো মাত্র দেখল বস্তাটা আছে, কিন্তু বৃদ্ধা নেই! প্রথমবারের মত সুব্রতর মনে কৌতূহল জাগে। বস্তার কাছে পৌঁছিয়ে সুব্রত বৃদ্ধার খোঁজে চারপাশে দৃষ্টি দিতেই, একটু দূরে বৃদ্ধাকে বিভিন্ন বাসের আশে পাশে ছোটাছুটি করতে দেখল।

"বাবা, আমি ভিক্ষা করে খাই। গাবতলী যামু। চাইরটা বাস চইলা গেল। আমারে কেউ নিল না। আমি ঈদে বাড়ি যামু" ক্ষীণ স্বরে বৃদ্ধা তখন লেগুনার এক কিশোর চালককে কথাগুলো বলছিল। কিশোর ছেলেটি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনের বাড়ি কোই?"

"বুগড়া গো, বাবা। আমি গাবতলী যামু। অ্যাটা বাসও হামায় নেয় না। হামার নাতিডারে এক বছর হল দেহি নাই। কতদিন হল পোলারেও দেহি নাই।" বলে বৃদ্ধা আবার কাঁদতে শুরু করে দিল। ছেলেটি আশেপাশে কিছুক্ষণ বাস খোঁজার চেষ্টা করল। অবশেষে গাবতলীর কোন বাস না পেয়ে, বৃদ্ধার হাতে ৫০ টাকা দিয়ে তাকে মিরপুর-আজিমপুর রুটের বিহঙ্গতে বস্তাসহ তুলে দিল। কি মনে করে সুব্রতও বিহঙ্গতে উঠে পরল।

৩য় খণ্ড

বাসের সিটে বসে একমনে বৃদ্ধাকে দেখছে সুব্রত। মহিলাটা অনেকটাই তার দাদীর মত দেখতে। মুখে বয়সের বলিরেখা, মাথায় সাদা চুল, উচ্চতা আর গায়ের রঙে একটু যা পার্থক্য। বাকি সব যেন একেবারে মিলে যায়!

ইতিমধ্যে বাস চলতে শুরু করেছে। একে একে কলাবাগান, ৩২ নাম্বার, শুক্রাবাদ পার হয়ে বাস এখন আসাদগেটে। অবাক হয়ে সুব্রত লক্ষ্য করল, বাস কন্ডাক্টার বৃদ্ধার কাছ থেকে কোন ভাড়া নিল না! বাস এখন শ্যামলীতে। সুব্রত তখনও একমনে বৃদ্ধাকে দেখে চলছে। এখন সময় সন্ধ্যে ছয়টা। টেকনিক্যাল মোড়ে বাস থামতেই সুব্রত বাস থেকে নামার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল ইতিমধ্যে বৃদ্ধা ও তার বস্তা বাস থেকে নেমে নিচে দাঁড়িয়ে। সুব্রত বাস থেকে নামতেই বাস মিরপুরের দিকে রওনা দিল।

৪র্থ খণ্ড

"বাবা গো, এডা কোন জায়গা? গাবতলী ক্যামনে যামু?" বৃদ্ধা তখন একজনকে জিজ্ঞেস করল।

এই প্রথমবার সুব্রত এগিয়ে গেল। বলল, "এটা টেকনিক্যাল, একটু সামনেই গাবতলী।" কথাটা শুনে বৃদ্ধা অসহায়ভাবে চারিদিকে দেখতে লাগল। সুব্রত আর দেরি করল না, তার সব বাঁধ ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গেছে। এটাইতো তার জন্য মোক্ষম সুযোগ। সে একটা রিকশা ডেকে বৃদ্ধা ও তার বস্তাকে রিকশায় তুলে দিল।

"ভাড়া কে দিব, মামা?", রিকশাওয়ালা বলে উঠল। সুব্রত রিকশায় উঠে বলল, "মামা, তোমার এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ভাড়া আমি দেব। তুমি গাবতলী চল।"

৫ম খণ্ড

সুব্রত এবার স্ব-উদ্যোগী। গাবতলীতে রিকশা থামার পর নিজ হাতে বৃদ্ধা ও তার বস্তাটিকে নামাল। এবার বৃদ্ধাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাছে কত টাকা আছে ?"

বৃদ্ধা কোন কথা না বলে, তার জীর্ণ শাড়ির বিভিন্ন গিট খুলে ৫০ টাকা বের করল।

"এ তো সেই ৫০ টাকা!" সুব্রত আপন মনে বলে উঠল।"আপনার কাছে আর কোন টাকা নেই? " "সব টাকা দিয়া আমি নাতিডার জন্য জামা কিনছি। আর টাকা নাই। আমি তো ভিক্ষা করে খাই, বাবা।"

কথাটা শুনে সুব্রত চুপসে গেল।

৬ষ্ঠ খণ্ড

তারপর সুব্রত বৃদ্ধাকে ফুটপাথের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে, বাসের খবর নিতে গেল। বিভিন্ন বাস কাউন্টারগুলোতে ঘুরে সুব্রতর মাথা ঘুরতে লাগল। ৬০০, ৬৫০, ৫৫০ কিংবা নিদেনপক্ষে ৪৫০ টাকার কমে কোন বাস যাবেই না! সুব্রতর পকেটে তখন ১৭০ টাকারও বেশি নেই। সে বুঝতে পারল না কি করবে! তারপরও অনেকক্ষণ ধরেই সে বিভিন্ন বাস কাউন্টারে ছোটাছুটি করল।

অবশেষে সুব্রতর বারবার অসহায় সেই বৃদ্ধার কথা মনে হতে লাগল। মানুষটাকে সে আশ্বাস দিয়ে এসেছে, তাকে বগুড়ার বাসে তুলে দেবে। মানুষটা তার জন্য হয়তো কতক্ষণ ধরেই না

দুর্বার

দিনদিন আমাদের কৈশোর বাঁধা পড়ে যাচ্ছে চার দেয়ালের ভেতর। তেপান্তরের মাঠে মাঝ দুপুরের উন্মাদনা, বৃষ্টিতে ভিজে মায়েরবকুনি খাওয়া, বর্ষার পানিতে ভেলা ভাসানো কিংবা বিকেলের হালকা আলোয় নাটাই হাতে ঘুড়ি ওড়ানো। এসব কিছুই আর দেখা যায় না নাগরিক কোলাহলে। তবুও প্রত্যাশা, কৈশোর হোক দুরন্ত, দুর্বার, বাধাহীন।

চিত্রগ্রাহক
শাহবাজ খান
গল্প
এএসএম রিয়াদ আরিফ